ধীরেন্দ্রলাল ধরের

হাসির গল্প

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উপহার

সূচীপত্র

অমরের আইডিয়া

দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করিয়া অমরের আর কোনো সন্দেহই রহিল না যে, পরীক্ষকরা এক যোগে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে ফেল করাইয়াছে। পরীক্ষকদের যে-কোনো একজনকে সামনে পাইলে সে যে কী করিত বলা যায় না। মনে-মনে সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—একটা কিছু সে করিবেই, এ অন্যায় সে সহজে সহিবে না।

কিন্তু কি করিবে তাহাই হইল সমস্যা।

সহসা সেদিন তাহার চোখে পড়িল, খবরের কাগজে বড় বড় করিয়া একটি লাইন ছাপা হইয়াছে—নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন। আইডিয়াটি তখনই অমরের মাথায় গজাইয়া উঠিল—All India Plucked Students' Conference—নিখিল ভারত ফেল-করা ছাত্র সম্মেলন। পরীক্ষকদের জব্দ করিতে হইলে সারা ভারতের সব ফেল-করা ছাত্রদের একসঙ্গে জড় করিতে হইবে। একবার সংঘবদ্ধ হইতে পারিলে পরীক্ষকদের জব্দ করার অনেক সুবিধাও হইবে।

সেই দিনেই জানাশুনা যাহারা ফেল করিয়াছিল অমর সকলকে ডাকিয়া আনিল। তাহার পড়ার ঘরে সন্ধ্যাবেলা ছোটখাট একটা সভাই বসিয়া গেল।

নিবারণ বলিল—কংগ্রেসে যেমন ভারতের সব জায়গা থেকে প্রতিনিধি আসে, আমরাও তেমনি সব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সব প্রদেশের ফেল-করা ছাত্রদের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানাব।

হরেন বলিল—কিন্তু পরীক্ষকদের আমরা কী করে জব্দ করব?

অমর বলিল—আমাদের সম্মেলন ভারতের সব য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যানসেলার আর এগজামিনারদের চ্যালেঞ্জ করবে—তাঁরা যেমন আমাদের পরীক্ষা করেছেন, আমরাও তেমনি তাঁদের পরীক্ষা করব।

নীলু বলিল—কিন্তু তাঁদের কোশ্চেন করবে কে? আমাদের পেটে যা বিদ্যে—যে কোশ্চেনই করি না কেন, তাঁরা ঠিক ঠিক জবাব লিখে দেবেন। তখন?

নিবারণ বলিল—সে ভাবনা আমার, তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। উপস্থিত তোমাদের প্রত্যেকে পকেট থেকে কিছু চাঁদা দিতে রাজি আছ কিনা তাই বল। সেই টাকায় প্রথমে আমাদের একটা আবেদনপত্র আর একখানা কোশ্চেন পেপার ছাপতে হবে। সেই আবেদনপত্র সব খবরের কাগজের আপিসে পাঠালেই তারা ছাপবে। খবরের কাগজে ছাপা হলেই সেগুলি ফেল-করা ছাত্রদের চোখে পড়বে। তখন তারা দলে দলে প্রতিনিধি পাঠাবে আমাদের এই সম্মেলনীতে। তখন একটা বিরাট ব্যাপার হবে। তারপর আমরা এক-একখানা ছাপানো কোশ্চেন পেপার এক-একটা য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যানসেলারের নামে পাঠাতে শুরু করব।

সকলেই নিবারণের কথায় রাজি হইল। তখনই সকলে বসিয়া আবেদনপত্রের একটা খসড়া লিখিয়া ফেলিল। লিখিল:

নিখিল ভারত ফেল-করা ছাত্রদের প্রতি নিবেদন

বন্ধুগণ—

পরীক্ষকদের পক্ষপাতিত্বে আমরা ফেল করিতেছি। ভাইস-চ্যানসেলার হইতে শুরু করিয়া সব পরীক্ষকেরা ষড়যন্ত্র করিয়া নিজেদের ইচ্ছামতো যা-তা প্রশ্ন করিয়া আমাদের ফেল করাইয়া দিতেছেন—যদি কোনোদিন ভাইস-চ্যানসেলার কি পরীক্ষকের চেয়ারে বসিবার দাবি করিয়া বসি—এই তাঁহাদের ভয়। আমাদের

সব য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যানসেলারদের চ্যালেঞ্জ করবে

একা একা পাইয়াই তাঁহারা এতটা সাহস করিতেছেন। আমাদের পরীক্ষার ফী-এর টাকাগুলি লইয়া দিব্যি মোটরে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আর আমরা কতকাল এই সব অন্যায় সহ্য করিব? গান্ধীজীর এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তো দূরের কথা—রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র কি রাজেন্দ্রপ্রসাদও যখন এ-সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিলেন না, তখন আমাদের সকলেরই বোঝা উচিত যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই দুর্নীতিকে আন্তরিক সমর্থন করেন। তাঁহাদের মুখ চাহিয়া আমরা এতোকাল বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি। আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এবার আমাদের সংঘবদ্ধ হইতে হইবে—সংঘবদ্ধ হওয়ার উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আপনাদের কাছে এই কারণে আমরা সংঘবদ্ধ হইবার জন্য আবেদন জানাইতেছি—আপনারা কি আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না?

সারা ভারতের বিভিন্ন ফেল-করা ছাত্র-সংঘের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা স্থাপনের জন্য আমাদের এই বিরাট সম্মেলনের আবাহন করিতে সংকল্প করিয়াছি। সেই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেকে সম্মেলনীকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন—ইহাই আমাদের কাম্য। প্রত্যেক ফেল-করা ছাত্র-সংঘকে সম্মেলনভুক্ত করিয়া লইবার ফী ধার্য করা হইয়াছে মাত্র পাঁচ টাকা। আমাদের বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ কর্মপদ্ধতির তুলনায় পাঁচ টাকা কিছুই নয়। আমাদের কার্য-নির্বাহক সমিতির প্রধান অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, যে অর্থ আমরা সংগ্রহ করিব সেই অর্থে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তাহাই হইবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। যে-সব ছাত্র বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেল করিবে তাহাদের সেই য়ুনিভার্সিটি হইতে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে, যাহারা উপর্যুপরি সাতবার ফেল করিবে তাহাদের দেওয়া হইবে রৌপ্যপদক। যাহারা ম্যাট্রিক হইতে এম. এ. পর্যন্ত সব

কয়টি পরীক্ষায় সাতবার করিয়া ফেল করিতে পারিবে, তাহাদের স্কলারশিপ দিয়া প্রফেসর ও পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইবে। শুধু তাহাই নয়, পরীক্ষায় ফেল-করা কৃতী ছাত্রদের বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। বিলাতের বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেল করিয়া তাহারা সর্বনিম্ন নম্বর রাখিয়া ফেল করার রেকর্ড সৃষ্টি করিবে।

তা ছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও ভাইস-চ্যানসেলারদেরও পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হইবে। তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছামতো প্রশ্ন করিয়া আমাদিগকে যে ফেল করাইয়া দিয়াছেন, আমাদের ইচ্ছামতো প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া তাঁহারাই বা কেমন করিয়া পাস করিতে পারেন, তাহাই আমরা সারা জগৎকে দেখাইব।

এই সব নানা দিকের খরচের কথা ভাবিয়া আমরা পাঁচ টাকার নিচে চাঁদা ধার্য করিতে পারি না। পাঁচ টাকা পাঠাইলে স্থানীয় ফেল-করা ছাত্র-সংঘকে আমরা এক সেট 'কোশ্চেন' পাঠাইয়া দিব। সেই 'কোশ্চেন পেপার' স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও ভাইস-চ্যানসেলারের কাছে পাঠাইয়া আপনারা উত্তরের দাবি করিবেন এবং উত্তর না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে পিকেটিং ও অনশন করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহারা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিলে দেখিবেন, য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যানসেলার ও পরীক্ষকেরা কিছুই জানেন না। আমাদের মতো লোকের পরীক্ষাতেও তাঁহারা ফেল করিয়া যাইবেন।

আশা করি, বন্ধুগণ, সংঘবদ্ধ হইবার এমন সুযোগ আপনারা ত্যাগ করিবেন না। আমরা আপনাদের সহযোগিতার প্রতীক্ষা করিতেছি! ইতি—

সভাপতি
কার্যনির্বাহক সমিতি
নিঃ ভাঃ ফেঃ ছাঃ সঃ

এইবার গণ্ডগোল বাধিল সভাপতি হিসাবে নাম সই করিবে কে? অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হইল যেহেতু নিবারণ তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করিয়াছে এবং তাহার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি উপস্থিত তাহাদের দলে আর কেহ নাই, তখন কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি সে-ই হইবে, আর অমর থাকিবে সেক্রেটারি।

সেদিন এই পর্যন্ত হইয়াই সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

পরদিন অমরের ঘরে আবার সভা বসিল। সেদিনকার প্রধান কাজ হইল কোশ্চেন পেপার ঠিক করা। ঠিক হইল ছাপার খরচ কমাইবার জন্য একখানি পেপারেই সব রকমের কোশ্চেন থাকিবে। চারিটি ভাগ করা হইবে। প্রথম ভাগে ইংরেজি, দ্বিতীয় ভাগে অঙ্ক, তৃতীয় ভাগে ইতিহাস এবং চতুর্থ ভাগে সংস্কৃত পরপর চারিদিন ধরিয়া আলোচনা করিয়া চারিটি বিভাগের প্রশ্নপত্র ঠিক হইল। সব প্রশ্নগুলি ছাপিবার জন্য সাজাইয়া গুছাইয়া ঠিক করিয়া লেখা হইল:

নিখিল ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভাইস্-চ্যানসেলার ও পরীক্ষকদের পরীক্ষা করিবার

প্রশ্নপত্র

প্রথম ভাগ—ইংরেজি

১। ইংরেজিতে অনুবাদ কর, মুসোলিনীর বক্তৃতার ধরনে লিখিতে হইবে।—

অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ঝাঁটা কাঠি দিয়া বেতের মোড়ার চারিদিক খুঁচ্ড়াইয়া যখন ছারপোকা বাহির হইল না তখন আনন্দে ঝিঁ ঝিঁ পোকা বেতালা বেসুরা গান ধরিল। টিকটিকি কয়েকবার টিক টিক করিয়া জিভ বাহির করিয়া হাসিল। আরশুলা ফর্র্ করিয়া ঘরের মধ্যে দু'বার উড়িয়া লইল। গুব্রে পোকা

গোবর না পাইয়া টিট্‌কারি দিল। জোনাকি পোকা দপদপ করিয়া ক'বার জ্বলিয়া উঠিল। চামচিকা পতপত করিয়া আলোর চারিপাশে দু'বার ঘুরিয়া ডানার ঝাপটায় দপ্‌ করিয়া সহসা আলোটা নিভাইয়া দিল। অন্ধকার ঘরে তারপর সকলে মিলিয়া গান ধরিল—

কুটকুট ঝিঁঝি টিকটিক ফরফর
আলোহীন ঘর
ওকে গলা টিপে ধর,
দপ্‌দপ্‌ চিঁচিঁ ঝপ্‌ঝপ গর্‌গর্‌
ঘি চপ্‌চপ্‌ তেল চপ্‌চপ্‌
মানুষের মাংস খাও গপ্‌গপ্‌।

২। How many kinds of ডিগবাজি খাওয়া ? Do you know ? Define and analyse each of them. কাইজারের সৈন্যদের প্যারেডের ধরন লিখ।

৩। ফুলস্টপ কবে এবং কি কারণে কমার মাথায় আসিয়া সেমি-কোলন হইয়াছিল ?

৪। Write an essay on :—

টিকটিকিরা আরশুলা ধরে খায়
আরশুলা সব দেশ ছেড়ে পালায়।
জোনাকি পোকা সেই খবর না পেয়ে
ব্যাঙকে নিয়ে এল সেথায় ধেয়ে,
বললে ডেকে আরশুলাদের রাজে—
'পালানো কি তোমার কভু সাজে ?
গোলন্দাজ রইছি আমি বড়,
গুলি তৈরিতে ব্যাঙ যে ভারি দড়।
আমরা থাকতে টিকটিকিরে ভয় ?
লড়াই করে কর না তারে জয় !'

দ্বিতীয় ভাগ—অঙ্ক

১। একটি হাতীর লঘুকরণ কর।

২। সমগ্র ভারতের ইতিহাস যদি দেড় টাকা মূল্যে বিক্রি হয় তাহা হইলে ময়ুর সিংহাসনের মূল্য কত?

৩। একটা রামছাগলের দাড়িতে যদি একশো চুল থাকে তাহা হইলে একটি মানুষের দাড়িতে কত চুল থাকিবে?

৪। একটি কাচের গেলাস উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। গেলাসটির দাম দু' আনা হইলে এক একটি টুকরার দাম কত হইবে?

৫। রেলগাড়ি ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে পিছনে যাইতে পারিলে সাইকেল ঘণ্টায় কত মাইল বেগে পিছনে ছুটিবে?

৬। প্রথম দিনে একটি লোক তিন ফুট হাইজাম্প করিলে হিমালয় লাফাইয়া পার হইতে তাহার কতদিন লাগিবে?

৭। কার্নেরা ও ম্যাকস্-বেয়ারের মধ্যে বকসিং হইলে যদি হাজার পাউণ্ডের টিকিট বিক্রি হয়, তাহা হইলে মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে বকসিং হইলে কত টাকার টিকিট বিক্রি হইবে?

৮। পরীক্ষায় ফেল করিলে লোকে প্রমোশন পায় না কিন্তু হার্টফেল করিলে পরলোকে প্রমোশন হয় কেন? ফরমূলা লিখ।

৯। একটি ত্রিকোণের একটি দিক যদি বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বাকী দুইটি দিক কি করিয়া সেই বৃদ্ধি রোধ করিতে পারে তাহাই দেখাও।

১০। Square লোককে all round বলিয়া থাকে। Square যে all round তাহাই প্রমাণ কর।

তৃতীয় ভাগ—ইতিহাস

১। একখানি ম্যাট্রিকুলেশন ইতিহাসের ছাপার খরচ যদি হয় তিনশত টাকা তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধে কত খরচ হইয়াছিল?

২। মহারাজা অশোক আমেরিকায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের যে সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার যথাযথ বিবরণ লিখ।

৩। রবার্ট ক্লাইভ বাংলা জয় করিয়া রেডিওতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ লিখ।

৪। শিবাজী এক ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া সব যুদ্ধই জয় করিয়া স্বাধীন মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, এবং রাণা প্রতাপ আর এক ঘোড়ায় চড়িয়া সব যুদ্ধে হারিয়া গেলেন কেন? ঘোড়া দুইটির আকার ও চরিত্রগত বিশেষত্বের তুলনামূলক সমালোচনা কর।

৫। গান্ধীজী মাথায় টিকি রাখিয়াছিলেন। দেশবন্ধু দাড়ি গোঁফ টিকি কিছুই রাখেন নাই। ইহার যথাযথ কারণ নির্দেশ কর।

৬। রবীন্দ্রনাথ কোন সালের কি মাসে কত তারিখে ক'টার সময় প্রথম কবিতা লিখিতে শুরু করেন? লিখিতে লিখিতে তিনি কলম কামড়াইয়াছিলেন কিনা, কামড়াইয়া থাকিলে কতগুলি দাঁতের দাগ পড়িয়াছিল?

চতুর্থ ভাগ—সংস্কৃত

১। চাণক্য ও সক্রেটিসের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ লইয়া যে বিবাদ হইয়াছিল এবং চাণক্য ইট মারিয়া সক্রেটিসের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ তাহার দ্বারা কিভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহাই লিখ।

২। সংস্কৃত ব্যাকরণে এখনও ঘিমুণ প্রত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মৎস্য মাংস্য ডিম্ব প্রভৃতি প্রত্যয়ও ছিল। কে সে সমুদয় আহার করিয়া শুধু ঘিমুণটাই ফেলিয়া রাখিয়াছে তাহার নাম লিখ।

৩। রাজা ও প্রজা শব্দের রূপ যদি একই হয়, তাহা হইলে রাজা মহামূল্যবান পোশাক পরিয়া সিংহাসনে বসিয়া হুকুম করেন আর প্রজা ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া সেই হুকুম পালন করে কেন?

এইখানে কোশ্চেন পেপারের প্রশ্নমালা শেষ হইল।

শুভস্য শীঘ্রম্। নিবারণ বলিল—এইবার সকলে চাঁদা দাও, আবেদনপত্র আর কোশ্চেন পেপার ছাপিয়ে আনি।

নিবারণের কথায় সকলেই পকেট থেকে পয়সা বাহির করিতেছে দেখিয়া দেবু বলিল—দেখ কাজটি একটা অদিনে অক্ষণে শুরু করবে? এতো বড় একটা ব্যাপার একটু দিনক্ষণ দেখে শুরু করা ঠিক হবে না কি?

অমর বলিল—তুই ভাত খাস দিন দেখে তো?

দেবু বলিল—তার মানে? দিন দেখে আমরা ভাত খাই না বলেই তো আজ আমরা এতো অজীর্ণ, আমাশয় ও পেটের অসুখে ভুগছি। শুভদিনে শুভক্ষণে রোজ ভাত খেলে কি এমন হত?

নিবারণ বলিল—কিন্তু পাঁজি দেখতে আমরা তো কেউ জানি না।

দেবু বলিল—আমি জানি। আমার বাবা কোকিলেশ্বর জ্যোতির্ভূষণ, আর আমি পাঁজি দেখতে জানব না?

অমর বাড়ির ভিতর হইতে পাঁজি লইয়া আসিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পাঁজির পাতা উল্টাইয়া গম্ভীরভাবে দেবু বলিল—এক মাসের মধ্যে ভাল সময় নেই।

আসলে ভিতরকার কথা হইতেছে যে, উপস্থিত দেবুর হাতে পয়সা নাই। দু'চার দিনের মধ্যে যে পয়সা-প্রাপ্তি যোগ আছে তাহাও না। সেদিন বাজার করিতে গিয়া ঘুড়ি কিনিবে বলিয়া চারিটি পয়সা সে চাপিয়া রাখিয়াছিল। পরে ধরা পড়িয়া গিয়া মার খাইয়াছে এবং এক মাসের জন্য জলপানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন কোশ্চেন পেপার ছাপাইবার চাঁদা দিবে সে কোথা হইতে?

—এক মাস সময় ভাল নেই, বলিস কী রে? তুই তাহলে পাঁজি দেখতেই জানিস না—বলিয়া নিবারণ সকলের মুখের পানে তাকাইল।

—বটেই তো, আমি কি আর পাঁজি দেখতে জানি! আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার কত বই পড়ে দেখলুম আর তোরা বলছিস আমি সামান্য পাঁজি দেখতে জানি না!

অমর বলিল—কী বই পড়েছিস্ নাম কর তো?

—কী পড়েছি শুনবি? পড়েছি কামস্কাটকার কুষ্ঠীবিচার, হটেন্‌টটের হস্তফল, জ্যোতিষের জলপিণ্ড, পঞ্জিকার পরমায়ু, করতল কর্কট, মাংসাশীর মাসফল, জীবনের জয়যাত্রা, আর কতো শুনবি?

—হ্যাঁ, অতো আর পড়তে হয় না, তোর বাবার বইয়ের নামগুলো শুধু মুখস্থ করেছিস।

—তোরা যদি আমায় তাই ভাবিস বেশ তাহলে তাই। কিন্তু আমার পেটে কি আছে তোরা কি বুঝবি? তবে আমার শেষ কথা এই যে, কোন অশুভ দিনে পয়সা খরচ করলেও কিছু হবে না। কাজেই এখন জেনে-শুনে আমি এতে অনর্থক পয়সা নষ্ট করতে পারব না, তোমরা না হয় আমাকে বাদ দিয়েই কর।

এতোক্ষণে দেবুর কথায় কাজ হইল। যাহারা পকেট হইতে পয়সা বাহির করিতেছিল তাহাদের পয়সা যথাস্থানে আবার ফিরিয়া গেল। ওদিক থেকে কে একজন বলিল—হাজার হোক ওর বাবা অতোবড় জ্যোতিষী ও যখন অতো করেই বলছে তখন তাড়াতাড়ির কি আছে বাপু, একমাস বাদেই হবে এখন।

শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত ফেল-করা ছাত্র সম্মেলনের কাজ এক মাসের জন্য বন্ধ রহিয়া গেল।

যাক্ ইহাতে তোমাদের লাভই হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা এই বিরাট সম্মেলনে যোগ দিতে চাও তাহারা এই অবসরে ফেল করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে এই সম্মেলনে যোগ দিবার নিমন্ত্রণপত্র ঠিক পাইবে।

মোহনের মৌলিকতা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কবে যেন বলিয়াছিলেন—বাংলার ছেলেরা নোট (notes) মুখস্থ করিয়া নিজেদের চিন্তাশক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, তাহাদের মৌলিকতা আর নাই, ইত্যাদি।

বক্তৃতাটি কোনো একখানি কাগজে ছাপাও হইয়াছিল। কেমন করিয়া জানি না, সেটা একদিন আমাদের মোহনের চোখে পড়িয়া গেল। মোহন মেধাবী ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল—এবার থেকে সে মৌলিক ভাবেই চিন্তা করিবে!

প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল, বাড়ির বারান্দা হইতে 'বাড়ি ভাড়া' লেখা বোর্ডটা ঝুলিতেছে। মোহন তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া সেটা নামাইয়া লইয়া নূতন করিয়া লিখিল—

ভাড়াটে চাই

পঞ্চাশ টাকা বাড়ি ভাড়া

যাঁরা দিতে পারেন,

তারাই অনুসন্ধান করুন।

স্কুলের মাস্টারমশাই 'এসে' লিখিতে দিলেন Rome was not built in a day. মোহন দেখিল তাহার চিন্তাশক্তির মৌলিকতা দেখাইবার এমন সুযোগ আর হইবে না। তাড়াতাড়ি সে লিখিতে শুরু করিল—

য়ুরোপের মানচিত্রে বুটজুতা-মার্কা ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী নগর রোম। য়ুরোপের বুকে ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরী। যিশুখ্রীস্টের জন্মকালে ধনে-মানে-প্রতাপে ও গৌরবে এই নগরী য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয় ছিল। কিন্তু এই রোমক সভ্যতার মূলানুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে, এই সভ্যতার মূলে ছিলেন ত্রেতাযুগের একজন ভারতীয় রাজা, তাঁহার নাম রামচন্দ্র। পিতৃসত্য

পালনের জন্য রাজা রামচন্দ্র যখন বনে যান, তখন ঐ স্থান জঙ্গল ছিল। প্রথমে রাজা রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া খানিকটা বন কাটাইয়া একটা কুঁড়ে-ঘর করেন। তাহার পর তাঁহাদের দেখাদেখি অনেকে আসিয়া ঘর বাঁধিতে থাকে। ইহাই হইল প্রথমে রোম নগরীর সূত্রপাত। এই রাজা রামচন্দ্রকেই রোমকেরা 'রামস্' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আর রামের ভাই হিসাবে লক্ষ্মণকে 'রামেলাস্' বলিয়াছেন, আমরা যেমন দশরথের পুত্রকে বলি দাশরথি, তেমনি।

অরণ্যের বুকে সামান্য কয়েকখানি কুঁড়ে-ঘর ক্রমে ক্রমে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে বিস্তৃতিলাভ করিয়া ভবিষ্যতে বিরাট রোম নগরী গড়িয়া ওঠে। রাজা রামচন্দ্রের নাম হইতেই এই নগরের নাম হইয়াছে রোম।

আর বেশি লিখিবার আগেই মাস্টারমশাই খাতা দেখিতে চাইলেন। মোহনের খাতা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির। মোহনের কানে বেশ করিয়া একটা পাক দিয়া বলিলেন—এ সব কি হয়েছে? মাস্টারের সঙ্গে ইয়ার্কি।

বেচারা মোহনের চোখে জল আসিয়া পড়িল, মুখে সে কিছুই বলিতে পারিল না। রচনার মৌলিকতার জন্য আরেকটি বড় বকশিস্ দিয়া মাস্টারমশাই মোহনের খাতাখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। মোহন বুঝিল, ইস্কুলের মাস্টারমশাই স্যার পি. সি. রায়ের বক্তৃতা পড়েন নাই।

মার খাইয়া মোহনের মনটা খারাপ হইয়াছিল, তার উপর বাড়ি ফিরিতে না ফিরিতেই বাবা ডাকিলেন—হ্যাঁরে, এতো ডেঁপোমি শিখলি কোত্থেকে?

ব্যাপারটা কি মোহন বুঝিতে পারিল না, বাবা বলিলেন—ভাড়াটে চাই লিখেছিস্ কেন? কে লিখতে বললে? বাঁদর কোথাকার! এখুনি খুলে এনে নতুন করে লেখ!

একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় মোহনের গালের উপর আসিয়া পড়িল।

মোহন সেদিন বুঝিল পি. সি. রায়ের কথা Charity must begin at home-এর মতো বাড়িতে ও ইস্কুলে চলিবে না এবং বাড়িতে চলিবে না বলিয়াই বক্তৃতা বাহিরে দেওয়া হয়। তার মানে বক্তৃতালব্ধ উপদেশগুলি আগে বাড়ির বাহিরে পথে-ঘাটে-মাঠে পালন করিয়া অভ্যস্ত হইলে, তারপর বাড়িতে পালন করিবার চেষ্টা করিবে।

সেইদিন হইতে মোহন বাহিরে মৌলিক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কি একটা কারণে মোহন বাসে করিয়া শ্যামবাজার যাইতেছিল। কণ্ডাক্টর আসিয়া টিকিট চাহিতেই মোহন জিজ্ঞাসা করিল—ক'পয়সা?

—পাঁচ পয়সা।

—পাঁচ পয়সা কেন? আমার বয়স তো মাত্র বারো বছর।

—তার জন্যে কি?

—রেল কোম্পানি বারো বছর বয়স পর্যন্ত হাফ্ টিকিট দেয় আর বাস কোম্পানি দেবে না?

কণ্ডাক্টরের সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া মেজাজটা কড়া হইয়াছিল, বলিল—দাও দাও খোকা, টিকিট দাও, বাজে বোকো না।

—টিকিট দাও মানে? বাস কোম্পানি আমাদের ঠকাবে, আর আমরা তাই শুনবো? অন্যান্য দিন অফিস্ টাইমে বুড়ো বুড়ো লোকেরা পাঁচ পয়সার টিকিটে বাস চাপবে, আর আমার মতো ছোট ছেলের বেলা বিকেল বেলাতেও পাঁচ পয়সা? আমরা দরদস্তুর করি না বলে তোমরা যা খুশি তাই করবে নাকি?

—বেশ বাপু টিকিট না দিতে পারো তো নেবে যাও—বলিয়া কণ্ডাক্টর ঘণ্টা বাজাইয়া বাস থামাইল।

—নিশ্চয়ই। নেবে তো যাবই। তা বলে তোমরা যতো অন্যায় নিয়ম করবে, তাই আমরা শুনবো নাকি?—বলিয়া গট্‌গট্ করিয়া মোহন নামিয়া গেল।

বেচারার আর বাসে ওঠা হইল না। হাঁটিয়া শ্যামবাজারের দিকে অগ্রসর হইল। যাহারা এমন করিয়া ঠকায় তাহাদের বাসে সে আর চাপিবেই না।

সেদিন একটি সিনেমার গায়ে হ্যারল্ডের এক হাসির ছবির বিজ্ঞাপন দেখিয়া মোহনের মাথা ঘুরিয়া গেল। পকেটে দেখিল পনেরোটি পয়সা আছে। আর যায় কোথা? মোহন টিকিট ঘরের মধ্যে পনেরো পয়সা সমেত হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল — টিকিট একখানা।

টিকিটবাবু পয়সা হিসাব করিয়া বলিল—আর পয়সা?

—আমি তো প্রায়ই এখানে ছবি দেখতে আস্‌ছি, একদিনও কন্‌সেসন পাবো না?

টিকিটবাবু তো হাসিয়া উঠিলেন, আশ-পাশের লোকেরাও হাসিয়া উঠিল। পয়সা পনেরোটি ফেরৎ দিয়া বলিলেন—খোকা, পাশেই খাবারের দোকান আছে, কিছু খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করগে, বুদ্ধি বাড়বে।

পয়সাটা লইয়া মোহন গুম্ হইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল। বড় কিছু করিতে গেলেই লোকে তাহাকে উপহাস করিবে, কিন্তু যখন সত্যই একদিন সে বড় হইবে, তখন আর কেহ তাহাকে উপহাস করিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথকে কি লোকে প্রথমে কম নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু আজ রবীন্দ্রনাথ জাতির গৌরব। সে-ও অমনি হইবে। রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা, চেষ্টা করিলে সে লিখিতে পারিবেই।

সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরিয়া মোহন কলম লইয়া বসিল। রবীন্দ্রনাথের মতো লিখিলে হইবে না, একেবারে মৌলিক লিখিবে, রবীন্দ্রনাথও যা কোনোদিন লেখেন নাই। অনেকক্ষণ মাথা ঘামাইয়া শেষে গাধা লইয়াই সে কবিতা লিখিতে শুরু করিল, মোহন লিখিল—

ওরে গাধা, তুমি শীতলার বাহন,
খোট্টা ধোপার প্রাণধন।
কাপড়ের সব পোঁটলা বও,
চুপ করে সব কষ্ট সও,
মুখে কভু বেরোয় নাক' রা,
স্বভাব তোমার পরের শুধু উপকারই করা
তবু কৃতঘ্ন এই মানব জাতি
'গাধাই' বলে দিবা রাতি,
তোমার গানে হয় না মাতোয়ারা।
যখন তুমি গাও গো বন্ধু হয়ে আত্মহারা
লাঠি নিয়ে খেদায় তখন,
বোঝে না তোমার সুরের মাতন
এম্‌নি অকৃতজ্ঞ মানুষ এরা,
ওগো পশুর সেরা!

এইবার মোহনের মন খুশি হইল, সে এমন কবিতা লিখিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবিও যাহা ধারণা করিতে পারেন নাই।

মোহন কবিতাটি শেষ করিয়া সুর করিয়া পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। যাহার মধ্যে এখন মৌলিক কবিতা লেখার প্রতিভা আছে, তাহার চিন্তাধারায় আবার মৌলিকতার ভাবনা! আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে এই কবিতাটি সে তাঁহার কাছে পাঠাইত, তিনি পড়িয়া কি বলিতেন শুনিত। ছাত্রমহলে মৌলিক চিন্তা করিবার শক্তি নাই, অমনি বলিলেই হইল! কিন্তু তাহার

আগে কোনো কাগজে এটিকে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, না হইলে লোকে তাহাকে চিনিবে কেমন করিয়া ?

মোহন তখনই কবিতাটি ভাল করিয়া লিখিয়া খামে পুরিয়া এক সম্পাদকের নিকট পাঠাইল।

সম্পাদক মহাশয় এখনও কবিতাটি ছাপেন নাই। মোহনের বিশ্বাস ওই কবিতাটি ছাপিলে পাছে সম্পাদককে ছাড়াইয়াও মোহনের নাম বাড়িয়া ওঠে, সেই ভয়েই সে ঐটি ছাপিতে পারিতেছে না। কিন্তু ভাল লেখা কতোদিন চাপিয়া রাখিবে, একদিন তাহা ছাপিতেই হইবে। মোহন সেই ছাপাইবার প্রতীক্ষায় মৌলিক চিন্তাধারা উপস্থিত চাপা দিয়া রাখিয়াছে। ছ'মাস ধরিয়া কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিয়া চলিয়াছে। তবে এইবার বোধ হয় ছাপা হইবে, কেননা মোহনের এতোখানি পরিচয় দিয়া যখন সম্পাদক মহাশয়ের কাছে কবিতাটি পাঠাইতেছি, তখন আর কথা কি !

তারপর মোহন আর কি কি করিয়া মৌলিকতা প্রকাশ করে তাহার কথা আমরা পরে শুনিতেই পাইব।

২

সত্যেনের সত্যিকথা

সত্যেনের জোড়া ছিল না আমাদের ক্লাসে।

কোনো কথা বললেই হয়, ওর মুখ দিয়ে যেন তুবড়ী ছোটে। মোহনবাগানের নাম উঠলেই বলে—ওঃ, গোষ্ঠ পাল? উনি তো আমার পিসে হন।

—আরে সেকি রে—তোরা বাঁড়ুয্যে আর উনি যে পাল?

কিন্তু অতো সহজে সত্যেনকে হটানো যায় না, সে বলে—বল্‌ছি, শোন্ না, উনি আমার পিসেমশায়ের ভায়ের মতো। পাশের বাড়িতেই থাকেন, একসঙ্গে তাস-দাবা খেলেন, আমরা তাঁকে 'ছোট পিসেমশাই' বলে ডাকি।

এর পর আর কারুর কিছুই বলার থাকে না। তবু ভোলানাথ ওপাশ থেকে বলে—বাংলাদেশের নামকরা প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই তোদের আলাপ আছে দেখছি,—কেউ তোর দাদার সঙ্গে সাঁতার কাটে, কেউ মামার সঙ্গে তাস খেলে, কেউ কাকার সঙ্গে বায়োস্কোপ যায়!

—তা থাকবে না কেন? তাঁরা তো আর দত্যি-দানব কিছু নন, এদেশেরই লোক, সাধারণ মানুষ, নাহয় নামই করেছেন!

সত্যেনের যুক্তি অকাট্য। ভোলাকে চুপ করতে হয়।

তবে ভোলানাথের সঙ্গে সত্যেনের মেলে না।

সেদিন ক্লাসে এসে সত্যেন যেই বললে—জানিস, বাংলার বাইরের এমন একটা লোকের সঙ্গে আজ আলাপ করেছি যে, তোরা শুনলে অবাক হয়ে যাবি। চার্লি চ্যাপ্‌লিনকে চিঠি লিখেছিলুম, তার জবাব দিয়েছে।

ভোলানাথ অমনি বাধা দিয়ে ওপাশ থেকে বলে উঠলো—কই, দেখি?

—কাল আনবো দেখিস, চিঠি শুরু করেছে my dear friend বলে, বুঝলি !

—সে না দেখলে আমি বিশ্বাস করবো না।

সত্যেনের মুখটা কালো হয়ে ওঠে, তবু জোর করে বলে—আচ্ছা, আনবো দেখিস কালকে।

কিন্তু চিঠি সে আনে না, অনেক 'কাল'ই কেটে যায়।

ভোলানাথের তাগিদেরও বিরাম নেই। বলে—তোরা জানিসনে, সবটাই ওর ধাপ্পাবাজি, আমি দেখছি এবার !

কিন্তু ভোলানাথ দেখবে কি, সে নিজেই একদিন জব্দ হয়ে যায়। কোন একসময় একখানা কাগজে চার লাইন কবিতা লিখে সত্যেন তার কোটের পিঠে আটকে দিয়েছিল। বাড়ি যাবার পথে যতো লোক তা পড়ে আর হাসে। তখন সে অতো বোঝেনি, বুঝলে বাড়ি গিয়ে। বই রাখতে গিয়েছিল পড়ার ঘরে, দাদা তো হেসেই খুন, উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে শুনিয়ে সুর করে পড়লে—

আমাদের ভোলাবাবু
পড়াতে বেজায় কাবু,
ক্লাসের লাস্ট বয়,
মাথা ভরা গোময় !

আবার দাদার হাসির ধুম !

সেদিন ভোলানাথের প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম হয়েছিল আর কি ! দাঁতে দাঁত চেপে ভোলা প্রতিজ্ঞা করেছিল—এ অপমানের শোধ সে নেবেই !

একাজ যে সত্যেনের তা সে বুঝেছিল, কেননা ক্লাসের মধ্যে একমাত্র সত্যেনই অমন কবিতা লিখতে পারে।

কিন্তু সত্যেনের সঙ্গে বুদ্ধিতে পেরে ওঠা ভোলার কাজ নয়, আর গায়ের জোরের কথা নাহয় ছেড়েই দিলুম। এই সেদিন

সরস্বতী পূজার সময় অতো লোকের সামনে একখানা লোহার পাত অনায়াসে সত্যেন বেঁকিয়ে দিলে। কাজেই ভোলা শুধু সুযোগের অপেক্ষাই করতে লাগলো।

সুযোগ একদিন মিলে গেল।

পণ্ডিতমশাই রোজ পাঁচ-ছ'টি করে ধাতুরূপ আর শব্দরূপ লিখতে দিয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঝিমুতে থাকেন। এদিকে টাস্ক লিখে লিখে তো সবাই পরিশ্রান্ত। একটা ং কি ঃ ভুল হলেই একটি করে গাঁট্টা, তার উপর খাতা দেখতে দেখতে টিফিন শেষ হয়ে যাবে, একটু যে হা-ডু-ডু-ডু খেলবে তারও উপায় নেই।

এমনিধারা আর কদ্দিন ভালো লাগে।

সত্যেন বললে—দেখ, আমি মজা করছি।

পরদিন পণ্ডিতমশায়ের ঝিমুনির ফাঁকে টেবিলের উপর থেকে নস্যির শিশিটা নিয়ে তার মধ্যে কি কতকগুলো গুঁড়ো পকেট থেকে বের করে মিশিয়ে দিলে।

তারপর তন্দ্রার ঝোঁকে এক টিপ নস্যি নিয়েই পণ্ডিতমশাই চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসলেন, তারপরেই একেবারে গোটা ছ'য়েক হাঁচি। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো, তন্দ্রা টুটে গেল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ক্লাস থেকে।

ক্লাস সুদ্ধ ছেলের মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

ভোলা এমন সুযোগ ছাড়লে না, অবসর বুঝে সে কখন টুপ করে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো পণ্ডিতমশায়ের পিছু পিছু।

ক্লাসে ঢুকেই পণ্ডিতমশাই হাঁকলেন—সত্যেন!

সকলেই চমকে উঠলো, সত্যেন কিন্তু নির্বিকার ভাবেই বললে—কি স্যার?

—কী স্যার, আমার নস্যিতে লংকার গুঁড়ো মিশিয়ে আবার চালাকি?

খটাখট করে সত্যেনের মাথার উপর অজস্র গাঁট্টা-বৃষ্টি চললো।

সকলেই বুঝলে একাজ ভোলার, বাইরে গিয়ে সে-ই পণ্ডিত মশাইকে সব বলেছে, নাহলে তিনি তো আর হাত গুণতে জানেন না! কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু তাকে বললে না।

সেদিন টিফিনের আগেই পণ্ডিতমশাই চলে গেলেন।

সত্যেন ক্লাসেই বসে রইল, বললে—আচ্ছা, আমিও দেখবো!

টিফিন পিরিয়ডটা সারাক্ষণ ব্ল্যাকবোর্ডে পণ্ডিতমশায়ের একখানি ছবি এঁকে সত্যেন তার নীচে ছ' লাইন কবিতা লিখে দিলে—

পণ্ডিত মশাই
গাঁট্টার কশাই,
নাকেতে নস্যি নিয়ে
হাঁচিলেন—হ্যাঁচ্ছো—
শিখাটি উঠলো নেচে,
খুলে গেল কচ্ছ!

টিফিনের পরেই হেডমাস্টার মশায়ের পিরিয়ড।

টিফিন শেষে হেডমাস্টার মশাইকে বারান্দা দিয়ে আসতে দেখে তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে সত্যেন জোর গলায় বলে উঠলো—ছবি যা এঁকেছিস ভোলা, তুই আর্টিস্ট হতে পারবি একদিন।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলের দৃষ্টি এসে পড়লো এবার ওই ব্ল্যাকবোর্ডের উপর। মজার ছবি দেখে তারা হাসবে কি, হেডমাস্টার মশাই ততোক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছেন। কথাটা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, বোর্ডের উপর একবার তাকিয়েই তিনি বললেন—এ ছবি কে এঁকেছে? ভোলা?

সত্যেন এই-ই চাইছিল, ভালোমানুষটির মতো মুখখানি কাঁচুমাচু করে বললে—হ্যাঁ, স্যার!

হেডমাস্টার মশাই বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকলেন—ভোলা, এদিকে এসো!

বেতমারা তিনি পছন্দ করতেন না, ভোলাকে পুরো একটি ঘণ্টা চেয়ার করিয়ে রেখে দিলেন, কোনো কথাই শুনলেন না।

ভোলা চেয়ার হয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে আর সত্যেন আড়চোখে এক একবার তাকিয়ে নিয়ে মুচকে মুচকে হাসে, তার চোখ ছুটি যেন বলে—কেমন জব্দ, আর লাগবে আমার পিছনে ?

মাথার গাঁট্টার ব্যথা তখন সত্যেন ভুলে গেছে।

সেইদিন থেকে ক্লাসের কোনো ছেলে আর সত্যেনের পিছনে লাগতে সাহস করতো না। ভোলার দৃষ্টান্ত তাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতো, তারা সত্যেনকে জব্দ করতে আর কোনো দিনই এগোয় নি, বলতো—বলাই চাটুয্যে ওর কাকার বন্ধু তো আমাদের কি, শিশির ভাদুড়ী ওর মামার সঙ্গে তাস খেলেন—আমাদের তাতে তো কোনো ক্ষতি নেই !

তবু সত্যেনের কথা শুনলেই তাদের গা রি-রি করে ওঠে।

কিন্তু সত্যেনের তাতে কি !

তবে সত্যেন ক্লাসে না জব্দ হলেও, একটি অচেনা ছেলের কাছে একবার ভারী ঠকে গিয়েছিল, সেই কথাই বলি :

সেদিন ৺রামকৃষ্ণদেবের উৎসব দেখে বেলুড় থেকে সত্যেন ফিরছিল। থার্ড ক্লাসে ভিড় হবে জেনে সে সেকেণ্ড ক্লাসের রিটার্ন টিকিট কেটে রেখেছিল। প্রথমেই যে সেকেণ্ড ক্লাস কামরাখানা দেখলে তাতেই সে উঠে পড়লো। ভিতরে তারই বয়সী একটি ছেলে বসে বসে একখানি মাসিকের পাতা ওলটাচ্ছিল। সত্যেন তার সামনের বার্থটায় গিয়ে বসলো।

ছেলেটি একবার মুখ তুলতেই সত্যেন কথা শুরু করলে,—আপনি মাসিক পত্রিকা পড়তে খুব ভালবাসেন দেখছি !

—না, তবে বাজে আড্ডা দেওয়ার চেয়ে মাসিকপত্রের ছুটো গল্প পড়া অনেক ভালো।

—নিশ্চয়ই। তা আপনি বুঝি শুধু গল্পই পড়েন?

—না, সবই পড়ি, তবে গল্পগুলোই পড়ি আগে।

সত্যেন বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে—সকলেই তাই পড়ে। আচ্ছা দেবানন্দ চৌধুরীর লেখা আপনার কেমন লাগে?

—চমৎকার। অমন হাসির গল্প আর কেউ লিখতেই পারে না।

ছেলেটিকে নিয়ে একটু মজা করার ইচ্ছা ছিল সত্যেনের মনে।

মুখে একটু হাসি নিয়ে সত্যেন বললে—দেবানন্দ চৌধুরী আমারই নাম।

ছেলেটি যেন একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল, বললে—আপনিই? নমস্কার! আমার কি সৌভাগ্য, আপনার মতো লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়া—

সত্যেন মনে মনে হেসে নিলে, গম্ভীরভাবে প্রতি-নমস্কার করে বললে—সৌভাগ্য আপনার নয়, সৌভাগ্য আমারই। আপনি যে আমার লেখা পড়ে মনে রেখেছেন, তাতেই আমি ধন্য।

—কি যে বলেন তার ঠিক নেই! আপনার মতো প্রতিভা ক'জনের আছে এদেশে? অমন হাসাতে আর তো কেউ পারে না। আচ্ছা, অতো হাসির কথা আপনি কি সব মন থেকেই লেখেন, ভেবে-ভেবে? না, সত্যিকারের ঘটনা?

—সত্যিকারের ঘটনা আর অতো পাচ্ছি কোথা? রাত জেগে বসে বসে ভাবি আর লিখি।

—লেখকমাত্রেই শুনি রাত জেগে লেখেন, তা আপনাদের শরীর খারাপ হয় না?

একটা মিছে কথা বললে তার সঙ্গে আরও অনেক মিছে কথা বলতে হয়, সত্যেন তা জানে, আরও জানে কেমন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে মিছে কথা বলতে হয়। বললে—শরীর আবার খারাপ হয় না, ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়। তবে কি জানেন,

এ একটা নেশা। সহজে ছাড়া যায় না। তার উপর হাসির গল্প সবাই চায়। সম্পাদকদের জ্বালায় বাড়িতে তো আর তিষ্ঠোবার উপায় নেই। তাই মনে করেছি দিন কতকের জন্যে কোলকাতা ছেড়ে চলে যাবো!

ছেলেটি হেসে বললে—তাতে না হয় সম্পাদকদের ফাঁকি দিলেন, কিন্তু লেখার নেশা ছাড়তে পারবেন কি?

—ওই যা বলেন। তবে এখন লিখছি বাধ্য হয়ে, আর তখন লিখবো খেয়াল মাফিক। তাতে লেখাও আরও ভালো হবে, এতো তাগিদ আর তাড়াহুড়ো তো থাকবে না।

—তাড়াহুড়ো করলে বুঝি লেখা ভালো হয় না?

—ভালো করে ভাববার সময় পাওয়া যায় না যে!

—বুঝেছি। কিন্তু যতো বেশি লিখবেন, টাকাও তো ততোবেশি পাবেন!

—টাকা যা পাওয়া যায় সে তেমন কিছু নয়। বাংলাদেশে পত্রিকা বিক্রি হয় কম, প্রকাশকের লাভ হয় না, লেখকদের অনাহারে মরতে হয়।

ছেলেটি সহানুভূতির দৃষ্টিতে সত্যেনের মুখের পানে তাকালো।

কতোটুকুই বা পথ। ট্রেন ততোক্ষণে হাওড়া প্লাটফর্মে ইন করছে।

ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে ছিল একটি সুটকেশ। হাতের মাসিকখানা তার মধ্যে রেখে অত্যন্ত কিন্তভাবে বললে—আপনি কোলকাতাতেই থাকেন তো?

—হ্যাঁ।

—আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?

—কি বলুন, কিন্তু হচ্ছেন কেন? সাধ্যপক্ষে রাখার চেষ্টা করবো।

—আসচে রবিবার আমার জন্মতিথি। বাড়িতে একটি প্রীতিভোজ

হবে। বন্ধু-বান্ধব অনেকেই আসবেন, সেদিন আপনার মতো একজন নামকরা সাহিত্যিককে পেলে আমরা কৃতার্থ হবো।

--বেশ, বেশ—ঠিকানাটা দিয়ে যান, আমি যাবার খুব চেষ্টা করবো। তবে কি জানেন, আমার সময় বড় কম, ঠিক কথা দিতে পারছি না।

ছেলেটি মুখ টিপে একটু হেসে বললে—তা হোক, তবু ঠিকানাটা রাখুন।

ছেলেটি একটি ছোট নামের কার্ড সত্যেনের দিকে এগিয়ে দিলে। কার্ডে নামটি পড়েই সত্যেনের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। হাতখানি থর থর করে কেঁপে উঠলো।

কার্ডের উপর লেখা ছিল :—

SJ. GNANANANDA CHOUDHURY
ARTIST & PHOTOGRAPHER
C/o. Sj. Debananda Choudhury.
No. 000, Rashbehari Avenue
Ballygunj, Calcutta. Phone : South 000123

—আরে জ্ঞানদা যে!—প্লাটফর্মে ভোলার ডাক শোনা গেল—নামুন, নামুন, আপনিও এ গাড়িতে এসেছেন, বেশ হয়েছে, দু'জনে একসঙ্গে বাড়ি যাওয়া যাবে। আপনার সঙ্গে উনি কে?

সত্যেন বাইরের দিকে পিছন ফিরে ছিল বলে ভোলা তাকে চিনতে পারে নি। তার কথার উত্তরে জ্ঞানানন্দবাবু বললেন—উনি আমার দাদা।

—আপনার দাদা?—দেবুদা! পথে যেতে যেতে একটা হাসির গল্প শোনাতে হবে কিন্তু তাহলে, দেবুদা।

ভোলা তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে এসে ঢুকলো।

—আরে এযে সত্যেন, জ্ঞানদা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলে বুঝি?

—ঠাট্টা মানে? ও ভদ্রলোকই মিনিট দশেক আগে এখানে

বসে বললেন যে উনিই লেখক দেবানন্দ চৌধুরী অর্থাৎ আমার দাদা।

—ওঃ! তাই নাকি!

হেসে হেসে ভোলার পেটে ব্যথা হবার যোগাড় হলো।

সত্যেনের মাথাটা তখন লজ্জায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মনে মনে বলছিল—হে মা তক্তাখণ্ড, দ্বিধা হও, আমি সেই ফাঁক দিয়ে নীচের লাইনের উপর লাফিয়ে পড়ি।

তারপর দিন থেকে ক্লাসে সত্যেনের মুখ একদম বন্ধ।

গাঁজাখুরী গল্প

ট্রেনে আসছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। শীতের রাত। জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে আসছি। গয়া থেকে একদল যুবক উঠলো আমার গাড়িতে। গাড়িতে জায়গা ছিল; থিতিয়ে গুছিয়ে বসে তারা এক একটি বিড়ি ধরালো। নীরবে বিড়িগুলি নিঃশেষ করে একজন বললো—ধুৎ, ঠাণ্ডায় বিড়ি তেমন জমছে না। এক ছিলিম গাঁজা চড়ালে মন্দ হয় না!

পোঁটলা থেকে একজন একটি গাঁজার কল্‌কে বার করলো। গাঁজা সাজা হ'ল, মুখে মুখে ফিরতে লাগলো গাঁজার কল্‌কে। দেখতে দেখতে ধোঁয়ায় চারিপাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, একটা বিদ্‌ঘুটে গন্ধে আমার মাথা ধরে গেল। আমার দিকের জানালাটা খুলে দিলাম। একজন হেসে বললো—বাংগালী বাবুর কষ্ট লাগছে, না?

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকে শীত করলেও বেশ স্বস্তি বোধ করলাম।

সহসা কোথা থেকে একটি পঙ্গপাল এসে পড়লো কামরার ভিতর এবং পড়লো এক গাঁজাখোরের কোলের উপর। ক'দিন আগে এ অঞ্চলে পঙ্গপালের উপদ্রব হয়েছিল, এটি বোধহয় সেই দলেরই একটি।

গাঁজাখোর সেই পঙ্গপালটি চোখের সামনে তুলে ধরলো, তারপর বললো—এই পঙ্গপাল আমাদের কতো ক্ষতি করে, কতো চাষী সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমার এক কাকা এই পঙ্গপাল থেকেই বড় মানুষ হয়ে গেল!

—কি রকম?

—আমি তখন খুব ছোট, সেই সময় একবার এদিকে পঙ্গপালের খুব উপদ্রব হয়েছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল এসে ক্ষেত-খামার সব নিশ্চিহ্ন করে দিলে। গাছে একটা পাতা অবধি রাখেনি।

কাকা ছিলেন পাটনায়। তিনি শুনলেন নেপালে পঙ্গপাল বিক্রি হয়, লোকে খায়। সেই দিনই তিনি গাঁয়ে এসে সব ক্ষেতের উপর জাল পেতে দিলেন। মাইলের পর মাইল শুধু জাল পাতা। পঙ্গপাল দলে দলে নামে আর আটকে যায়। সেই সব পঙ্গপাল ধরে প্যাক্ করে তিনি চালান দিলেন নেপালে। সেখানে তখন পঙ্গপালের সের দু'-পয়সা করে। কাকা লাখ লাখ মণ পঙ্গপাল সেবার বিক্রি করেন। তা থেকে তিনি যে টাকা পান তাইতেই পাটনা শহরে প্রকাণ্ড বাগানওয়ালা বাড়ি, গাঁয়ে প্রায় হাজার খানেক বিঘে জমি তিনি খরিদ করেন।

প্রত্যেকেই নিবিষ্ট মনে গল্প শুনছিল। এবার দ্বিতীয় গাঁজাখোর বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বললো,—ও রকম হয়! আমার পিসেমশাইয়ের ঠিক অমনিই হয়েছিল। সেবার সেই যে ভয়ানক ঝড় হয়ে গেল। আমার পিসেমশাই তখন বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝড়ের এক ঝাপটা এসে লাগলো; তারপরেই পিসেমশাই দেখেন কি যে তিনি একেবারে আকাশে উঠে গেছেন। তাঁর ভয় হ'ল তিনি পড়ে যাবেন। কিন্তু তিনি পড়লেন না, এসে নামলেন এক গাছের উপর। কোথায় জানো? ইংলণ্ডে। পৃথিবী তো চব্বিশ ঘণ্টায় একপাক ঘোরে। পিসেমশাই যতোক্ষণ শূন্যে ছিলেন পৃথিবী ততোক্ষণে খানিকটা ঘুরে গেছে, কাজেই তিনি নেমেছেন একেবারে বিলাতে। তাঁর ভালই হ'ল, তিনি তখন ডাক্তারী করছিলেন। বিলাতে থেকে এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস. হয়ে ফিরলেন। বড় ডাক্তার হিসাবে পশার জমে উঠলো।

—তুমি তো ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবার কথা বলছ—তৃতীয় গাঁজাখোর বললো;—আমার জ্যাঠামশাই উড়েছেন বহুবার। তিনি আসামে চাকরী করতেন। আসাম মুল্লুকের মশা তো জানো? যখনই তাঁর খেয়াল হ'ত দেশে আসবেন, তখনই রাত্রে চিটেগুড় গায়ে মেখে শুতেন। আর মশা কামড়াতে এসে গায়ে আটকে

যেত। তারপর এক গা মশা বন্ বন্ করে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে আসতো দেশে। মশার বন্ বন্ শব্দ এমনই হ'ত যে, মনে হ'ত যেন এরোপ্লেন আসছে! সেই শব্দ শুনলেই আমরা বুঝতাম যে জ্যাঠা-মশাই দেশে এলেন।

—তুমি মশায় মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার কথা বলছ,—চতুর্থ গাঁজাখোর বললো,—ছারপোকা লোককে টেনে নিয়ে যায় দেখেছ? আমাদের গাঁয়ের মোড়ল ছিল খুব দুর্দান্ত। তাকে শায়েস্তা করার জন্য গাঁয়ের লোকেরা বাছাই করে বড় বড় ছারপোকা ছেড়ে দিয়ে এসেছিল তার খাটিয়ায়। সে জানে না, রাত্রে ঘুমিয়েছে; সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে ছারপোকাগুলো তাকে টেনে নিয়ে গেছে একেবারে গাঁয়ের বাইরে এক জংগলের মাঝে।

—বড় ছারপোকা, হুঁঃ!—পঞ্চম গাঁজাখোর বললো,—আমার দাদা একজোড়া পিঁপড়ে পুষেছিল। তাদেরকে মাখন খাওয়াতো আর রোজ এক মাইল করে দৌড় করাতো। একবছরের মধ্যে পিঁপড়েগুলো আরশুলার মতো বড় হয়ে গেল। তারপর লাগালো ইন্‌জেকশান। আর এক বছরে সেগুলো হ'ল বিড়ালের মতো। তখন সে সে-দু'টি বেচে দিলে জার্মানীর হেগেনবেক্ সার্কাসে। তখন জার্মানীর সঙ্গে লড়াই চলছে। জাহাজে যাবার সময়ে ইংরেজরা সেই জাহাজখানি ডুবিয়ে দিলে, নইলে আমার দাদার নাম হ'ত আজ বিশ্বযোড়া।

এবার আমার দিকে সবাইকার নজর পড়লো, একজন বললো,—বাংগালী বাবু, আপনি কিছু বলছেন না?

আমি আর কি বলবো? আমি বললাম,—আপনারা পিঁপড়ের কথা বলছেন, ছেলেবেলায় আমারও কানের মধ্যে একটি পিঁপড়ে ঢুকেছিল। কামড়ে কামড়ে আমার কান এত ফুলিয়ে দিয়েছিল যে, একটা কান একেবারে হাতীর মতো হয়ে গিয়েছিল। গরমের দিনে আমি সেই কান দিয়ে বাতাস খেতাম। কতো লোক দেখতে

আসতো। দেখার টিকিট করেছিলাম এক পয়সা। তা থেকে এক মাসে আমার দশ হাজার টাকা আয় হয়েছিল। সেই থেকে পাছে আর কখনো আমার কানে কিছু ঢোকে তাই মোম দিয়ে কান বন্ধ করে দিয়েছি, আর কিছুই শুনি না।

গাঁজাখোর পাঁচজন মাথা নেড়ে বিজ্ঞভাবে বললো,—হ্যাঁ হ্যাঁ, কানের মধ্যে পোকা-মাকড় ঢুকলে অমন হয়, আমরা জানি।

নরাণাং শ্বশুর ক্রমঃ

সরোজের বরাতক্রমে বড়লোক শ্বশুর জুটিয়াছিল ভালো। রাজেনবাবু শুধু শিখিয়াছিলেন সঞ্চয় করিতে, কি করিয়া যে পয়সা খরচ করিতে হয় সে কথা তাঁহার কপালে লিখিতে বিধাতাপুরুষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যখন তখন হাত পাতিয়াই বলেন—দেখি বাবাজীবন, আজ গোটা দুয়েক টাকা ধার দাও দিকি···

—কিন্তু···

—দুর্ভাবনায় মাথা চুলকাচ্ছ কেন বাবাজী, তোমার টাকা মারবো না, সবই শুধে দোব একসঙ্গে।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মুখ ফুটিয়া সরোজ একদিন বলিয়াই বসিল,—কিন্তু প্রায় শ' তিনেকের কাছাকাছি হোল যে—

—তার জন্যে কি হয়েছে, তোমার টাকার ভাবনা কি বাবাজীবন, চারটে পাশ করেছ, আজ বাদে কাল কোর্টে বেরুলে তোমার পয়সা খায় কে?—ধুলোমুঠি ধরলে কড়িমুঠি হবে! তোমার আবার টাকার ভাবনা।

ভাবনা থাক্ আর না থাক্ শ্বশুর মহাশয়ের কাছ থেকে যে এক পয়সা পাওয়া যাইবে না, তাহা সরোজ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিল। ল' পাশ করিয়া কোর্টের গাছতলায় যদ্দিন ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে তদ্দিনের রসদ সংগ্রহের আশায় বেচারা শ্বশুর পাকড়াইতে আক্কেল-সেলামি দিতেছে প্রচুর।

রাজেনবাবু যে কেবল টাকাই ধার লইতেন তাহা তো নয়, হয়তো একদিন আসিয়া বলিলেন—বাবাজীবন চল দিকি, বায়োস্কোপে 'রামায়ণ' পালা হচ্ছে দেখে আসি—

যে লোকটি নাপিতের খরচ কমাইবার জন্য মাসে একবার করিয়া দাড়ি কামায়, রবিবারে খবরের কাগজ কিনিয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া

পড়ে তাহার সঙ্গে পাশাপাশি সীটে বসিয়া বায়োস্কোপ দেখিতে হইবে ভাবিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি বলিল—এখনই আমাকে একবার বিশেষ দরকারে যেতে হবে।

—সে তো যাবেই বাবাজী! দরকার তো তোমার রোজই আছে। কিন্তু এ যে রামায়ণ বলে কথা, ধর্মের ডাক—একে এড়িয়ে যাবার কি যো আছে বাবাজী? তার উপর তোমার মতো সজ্জন জামাই থাকতে শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, শ্রীলক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সীতাদেবীর পতিভক্তি জীবন্ত দেখে নয়ন সার্থক করে নি বাবাজী, নাহলে বয়েস তো বাড়ছে, হয়তো আর···

—কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তা নয়, দেখার কিছু নেই, আমি একবার দেখেছি।

—ওকথা বলতে নেই বাবাজী, রামায়ণ একবার কেন, শতবার দেখলেও কি পুরানো হয় বাবাজী?

—কিন্তু···,

—'কিন্তু'র কিছু নেই বাবাজী। নিজের ধর্মশাস্ত্রকে অতো ছোট করে দিও না। শ্রীরামচন্দ্রের কথা অমৃত সমান। কৃত্তিবাস ওঝা কহে শুনে পুণ্যবান॥ ও কি যা তা বাবাজী! যিনি একবার ওর রসাস্বাদ করেছেন তিনি বড় না হয়ে যাননি। মাইকেল কি রামায়ণ কথা কম পড়তেন? ছোট্ট মেঘনাদ বধের এক কাহিনী লিখেই তিনি অমর হয়ে আছেন। তার উপর গান্ধীজী, আশুবাবু, বিদ্যাসাগর, তোমাদের রবি ঠাকুর, কতো নাম করবো, তুমি তো সবই জানো বাবাজী, নাও এখন তাড়াতড়ি তৈরি হয়ে নাও, পাঁচটা তো বাজে···

—কিন্তু আমার হাতে এখন টাকা···

—টাকা তোমার হাতে থাকে না, তা আমি জানি। টাকা ছিল তোমার জামার পকেটে,—এই যে তোমার মনি ব্যাগটা আমি নিয়েই এসেছি। এতে দু টাকা দু আনা আছে, একটাকা দু আনা

ও থেকে আমাকে ধার দিলেই হবে—নাও, এখন তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে নাও দিকি !

আবার ধার ! যাহা গেছে তাহা তো গেছে। তার উপর মনি ব্যাগটা পর্যন্ত শ্বশুরমশাই হাতাইয়া বসিয়া আছেন, দেখিয়া সরোজের চোখ কপালে উঠিয়া মূর্ছা যাইবার উপক্রম হইল।

—কৈ বাবাজী নাও, তৈরি হয়ে নাও !

সরোজকে বাধ্য হইয়া তৈরি হইতে হইল, 'স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি'র পিতা, কোনো কথা বলিবার তো আর উপায় নাই। তাহা হইলে আবার নতুন করিয়া 'দেহি পদবল্লব মুদারম্' পালা গাহিতে হইবে, অথচ জানাশুনা 'জয়দেব' কেহ তো নাই যে, গীত-সরোজ লিখিয়া যাইবে, পালা গাওয়াই ব্যর্থ হইবে। একদিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার চেয়ে ভাগ্যবান ছিলেন, পরস্ত্রীর মান ভাঙ্গাইয়া তিনি নাম করিয়া গেলেন, আর নিজের স্ত্রীর মান ভাঙ্গাইয়া সরোজ এতোটুকু নাম পাইবে না ! বেচারার আপসোস !

যাক্ সে কথা, মিনিট কয়েকের মধ্যে সরোজকে শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

পথে আসিয়া রাজেনবাবু বলিলেন—চলো, বাসেই যাই—

এক টাকা দু আনা তাহার উপর আবার বাসভাড়া ! কাল মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা দেখিবে কোথা হইতে ! বেচারা সরোজের মুখ শুকাইয়া গেল।

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সরোজের মুখের পানে একবার তাকাইয়া রাজেনবাবু বলিলেন—তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেল বাবাজীবন ! ভয় নেই, ভয় নেই, আমার সঙ্গে বাসে চাপলে ভাড়া লাগবে না, এসো—

একখানি চলতি বাস থামাইয়া রাজেনবাবু উঠিয়া পড়িলেন, সরোজকেও উঠিতে হইল।

দোতলায় উঠিয়া কতোক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর কণ্ডাক্টর আসিয়া হাত পাতিল—টিকিট ?

রাজেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কত ?

—কোথায় নামবেন ?

—বায়োস্কোপের সামনে।

—পাঁচ পয়সা !

—দুজনের ?

—না, একজনের।

—অ্যাঁ ! দুপুর বেলা প্রচণ্ড রোদের সময় যখন বাস না হ'লে এক পা চলা যায় না, তখন ভাড়া নাও তিন পয়সা। আর এই বিকেল বেলা স্বচ্ছন্দে আমরা এটুকু পথ হেঁটেই যেতে পারি, আর তুমি খামকা কি না ডবল ভাড়া নেবে ? যাক গে, বিকেলের টিকিট আমার দরকার নেই, তুমি আমায় দুপুরের টিকিটই দু'খানা দাও।—

—তা হয় না স্যার।

—বেশ, তা যদি না হয় তো পুরোনো খদ্দের হিসেবে একটি সুবিধা করে দাও, রোজ যে বাসে চাপি, আজ একটা কনসেশন দাও। চার পয়সা করে নাও, তোমার কথাও থাক আমার কথাও থাক, না হোলে তো আমরা ট্রামেও চাপতে পারি।

রাজেনবাবুর রসিকতায় বাসশুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল।

কণ্ডাক্টর বলিল—দিন্, টিকেট দিন !

—ওই পাঁচ পয়সাই ?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের বাস কোম্পানি কি মাড়োয়ারীর ব্যবসা নাকি ভাই ?

—ওসব জানি না মশাই, ভাড়া দিন।

—বেশ, তাই না হয় দিচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কর্তাকে বলো যে, আজ থেকে তারা একজন পুরোনো খদ্দের হারালো—বলিয়া রাজেন-বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, আমার মনিব্যাগ ? এইমাত্র পকেটে রেখেছি, এক্ষুণি কে পকেট কাটলে ? টাকা সমেত মনিব্যাগ।

রোজ যে বাসে চাপি, আজ একটা কনসেশন দাও।

কণ্ডাক্টর বেগতিক দেখিয়া বাস থামাইল, রাজেনবাবু সরোজকে লইয়া নামিয়া পড়িলেন।

বাসখানি চলিয়া যাইতেই রাজেনবাবু প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইলেন, বলিলেন—দেখ্‌লে তো বাবা, বুদ্ধি থাকলে কলকাতা শহরে পয়সা না দিয়েও বাসে চড়া যায়! অতোক্ষণ বাজে বকছিলুম কেন জান ?—অনেকটা পথ এগিয়ে আসবো বলে।

—সব মিথ্যে! সব মিথ্যে! ব্যাগটা ট্যাঁকে রেখেছিলুম বলেই না এতোটা পথ এম্‌নি চেপে আসা গেল, নাহলে আমার পকেট মারবে এমন লোক তো আজও বাংলায় জন্মায়নি।

সরোজের বুক-ধড়ফড়ানিতে যেন মকরধ্বজের প্রলেপ পড়িল। বিমর্ষ ভাবটা তবু কতকটা শান্ত হইল।

দুজনে বায়োস্কোপের কাছাকাছি আসিয়াই বাস হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। এবার টিকিট কিনিয়া ভিতরে ঢুকিল। সরোজ দেখিল, 'টারজেন দি এপ্‌ম্যান' বই চলিয়াছে, রামায়ণ নয়। রবিবারে একখানি করিয়া কাগজ কিনিয়া যিনি পনেরো দিন ধরিয়া পড়েন, বায়োস্কোপের ছবি যে ইতিমধ্যে দুতিন বার বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে তাহা তিনি জানিবেন কেমন করিয়া ? সরোজের শাপে বর হইল। 'টারজেন দি এপ্‌ম্যান' দেখিবার সে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, শ্বশুর মশাইকে সে কিছুই বলিল না।

রাজেনবাবুর ইংরেজী জ্ঞান যাহা ছিল, তাহাতে পেটে ডুবুরী নামাইলেও এ, বি, সি, ডি, উদ্ধার করা যাইত না। চুপ করিয়া তিনি ছবি দেখিয়া চলিলেন। ইন্টারভ্যালেও তিনি কোনো কথা বলিলেন না, বলিলেন একেবারে বই শেষ হইলে, বাহিরে আসিয়া ঃ

—আশ্চর্য, এই নিয়ে কাগজে কিছু লেখে না ?

—কি নিয়ে ?

—আমাদের অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে ওরা কিনা এমন জংলি করে তুলেছে! সীতাকে এমন মেম্‌ সাজিয়েছে, আর শ্রীরামচন্দ্র অমন

বাঁদরের মতো ডাক্‌ছে—ছি! ছি। এদেশে মানুষ নেই দেখি! এতো খদ্দর পরে; কংগ্রেস করে, অথচ এর একটা কেউ প্রতিবাদ করে না···আচ্ছা বাবা, এটা কি শুধু অরণ্যকাণ্ডটাই দেখালে, না? রাবণকে তো দেখলুম না···

হাসি চাপিয়া রাখা সরোজের পক্ষে কঠিন হইল। একটাকা দু আনার শোক সে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া গেল।

শ্বশুর মশায়ের ধারের হিসাব দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল, সরোজ চক্ষুলজ্জার খাতিরে যে একেবারে তাগিদ দেয় নাই, তাহাও নয়, কিন্তু তাগিদ দিলেই রাজেনবাবু বলেন···আরে, তোমার টাকা দোব না এ কি আবার একটা কথা হোল। অতো তাগিদই যদি দাও, বাবাজী তাহলে তোমার কাছ থেকে আর ধার নোব কেন, কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে ধার নিলেও তো পারতুম। তোমার আবার টাকার ভাবনা বাবাজী, তোমার পেটে যা বিদ্যে আছে তোমার বুদ্ধি খরচ করলেই টাকা···

সরোজ মনে মনে বলিল—আচ্ছা, বুদ্ধি খরচ করেই আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'রবো, দাঁড়ান!

সেদিন শ্বশুর মহাশয় আসিতেই সরোজ বলিল—আপনার উপদেশ মতোই চলেছি, এবার দেখুন টাকা লাভ করবো—

—কী বাবাজী?

—আমি বুদ্ধি খরচ করে রিসার্চ করে একটা জিনিস বা'র করেছি—

—কী?

দেখবেন টাকায় টাকা লাভ হবে, আমি এবার রেস খেলবো!

—সর্বনাশ, এ দুর্বুদ্ধি তোমায় কে দিলে?

—দুর্বুদ্ধি নয়। আমি নিজের ঘোড়া কিনে রেস খেলবো?

—অতো টাকা কোথায় পাবে?

—আপনার কাছ থেকে উপস্থিত ধার নোব।

—আমার কাছ থেকে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু…

—বেশ, আপনি না দেন আমি এই বাড়ি বেচে টাকার যোগাড় করবো—

—সর্বনাশ…

—সর্বনাশ কিসের আবার ? আমার টাকায় টাকা লাভ হবে, আমি নিজে রেসের ঘোড়া কিনবো, আমি রেস খেলবো—

—ও কাজ করো না বাবাজী, ওতে…

—আপনি ওই সব কথাই ভাবুন। আমি রিসার্চ করে বার করেছি, 'কালিম্পং' থেকে বিশ মাইল দূরে 'ফাঁকিম্পং'য়ে একরকম ঘাস জন্মায়। সেই ঘাস একবার পেটে পড়লে, শরীর অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠে, খালি ছুটতে ইচ্ছে করে। সেই ঘাস ঠিক ছ'মাস কোনো ঘোড়া খেলে সে মিনিটে পাঁচ মাইল বেগে ছুটতে পারবে,—এ সব আমার একেবারে সঠিক হিসাব। সেইজন্য আগে একটা ঘোড়া কিনতে হবে, সেই টাকা চাই। আপনি না দেন বাড়ি বেচে দেব, তারপর আমার ঘোড়া যখন ফার্স্ট হবে তখন এমন কতো বাড়ি কোলকাতায় হাঁকিয়ে ফেলবো, দেখবেন তখন—

—কিন্তু, বাড়িটা বেচা…

—এতে কিন্তুর কিছু নেই। ফাঁকিম্পংয়েব ঘাস খেলে ঘোড়া আমার ফার্স্ট হবেই, এক টাকা খরচে তখন দশ টাকা লাভ পাবো। আপনি যদি এখন আমায় টাকা দেন, তাহলে আমি শেষ পর্যন্ত আপনাকে শতকরা পঁচিশ টাকার অংশীদার করে নিতে পারি। যদি বলেন তো এখুনি স্ট্যাম্পের উপর সই করে দিচ্ছি—

—না না বাবাজী, আমি কি সে কথাই বলছি, তোমায় কি আমি অবিশ্বাস করি ?

—বেশ, অবিশ্বাস যদি না করেন তো কালই আমায় দুশো টাকা

পাঠাবেন, কালই আমি ঘোড়া কিনতে চাই। আর, আসছে সপ্তাহে আপনি নিজে নিয়ে আসবেন আরো তিনশো, সেই টাকায় উপস্থিত ছ' মাসের মতো ঘাস কিনতে হবে, বুঝলেন ?

রাজেনবাবু আর নতুন করিয়া কি বুঝিবেন, পয়সা কি করিয়া উপায় করিতে হয় তাহা তিনি ভালো করিয়াই জানেন, তাঁহার চোখের সামনে ঘোড়দৌড়ের মাঠের ছবি ভাসিয়া উঠিল।

দিনছয়েক পরেই উলুবেড়িয়া হইতে সরোজের নামে ছশো টাকার মনি অর্ডার আসিল।

তাহার পর ক'দিন যাইতে-না-যাইতেই শ্বশুরমশাই আসিয়া হাজির, বলিলেন—বাবাজী, ঘোড়া কিনেছ ?

সরোজ হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই। শুভস্য শীঘ্রং—ওসব কাজে দেরি করতে আছে ? যেদিন আপনার টাকা পেলুম, তার পরদিনেই ঘোড়া কিনেছি।

—কেমন ঘোড়া কিনেছ আমি আজ একবার দেখতে এলাম বাবাজী !

—নিশ্চয়ই একশো বার দেখবেন, আপনার টাকায় ঘোড়া কিনলুম আর আপনাকে দেখাবো না ? বলুন না এখুনি দেখিয়ে আনছি, তবে এখন সে ঘোড়া দেখে আপনি সুখী হতে পারবেন না, একে জংলী তার উপর খুব রোগা দেখে কিনেছি—

—তা হোক্ বাবাজী, চলো একবার দেখে আসি। বলিয়া রাজেনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সরোজ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া খানিক দূরে পথের মোড়ে গাড়ির 'স্ট্যাণ্ডে' দাঁড়াইয়া-থাকা একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ির একটি ঘোড়ার কাছে লইয়া গিয়া বলিল—ওই ঘোড়াটা—

—ওই ঘোড়াটা ? ও তো গাড়ির ঘোড়া !

—আজ্ঞে না, ওটা গাড়ির ঘোড়া নয়, ওটাকে আমি ইচ্ছে করেই ওই গাড়িতে জুতে রাখিয়েছি। জংলী ঘোড়া, ওকে ঠিক

ছুটিয়ে ছুটিয়ে এখন পোষ মানাতে হবে। সেজন্য মাইনে দিয়ে আবার একটা সহিস রাখবো, তাই অনেক ভেবে-চিন্তে ওটাকে গাড়িতে জুতিয়ে দিয়েছি, ঘোড়াটার পোষমানারও ঠিক ব্যবস্থা হবে, উপরন্তু গাড়ির মালিকের কাছ থেকে কিছু কিছু পাওয়াও যাবে, সহিসের মাইনেটাও বাঁচবে।—একটা ইকনমি হোল, বুঝলেন না ?

ইকনমি কথাটার মানে শ্বশুরমশাই বুঝিলেন কিনা জানি না। তাড়াতাড়ি তিনি কয়েক পা আগাইয়া গেলেন ঘোড়াটির গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতে। সরোজ দেখিল, এইবারেই বিপদ। ঘোড়ার গায়ে হাত দিলেই সহিসটা যদি কয়েকটা কথা শুনাইয়া দেয় তখন সবই তো জানাজানি হইয়া যাইবে, তাড়াতাড়ি বলিল—ও কি করেন ! কাছে গিয়ে গায়ে হাত-টাত দেবেন না যেন, নতুন জংলী ঘোড়া এখুনি চাঁট মারতে পারে, আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভালো !

রাজেনবাবুর বয়েস হইয়াছে, তার উপর পাড়াগাঁয়ের লোক। জামাইয়ের কথা শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ভয়ে পিছাইয়া আসিলেন। বলিলেন—কিন্তু বাবাজী, বড় রোগা !

—আজ্ঞে, রোগা দেখেই তো কিনেছি। রোগা না হলে তো ছুটতেই পারবে না। তার উপর কলের জল আর ফাঁকীস্পংয়ের ঘাস পেটে পড়লে দেখবেন এই ঘোড়াই আরো তুহাত লম্বা হবে, এক একবার পা ঠুকবে আর মেঝের ওপরে আগুনের ফুল্‌কী উঠবে, তখন বলবেন 'বাবাজী বলেছিলে'। দেখবেন এমন লাভ করবো, যা আপনি কখনো ধারণা করতেও পারবেন না ! যাক্ সে কথা, ঘোড়া তো দেখলেন, এখন ফাঁকীস্পংয়ের ঘাসের দাম শ-তিনেক টাকা দিন, একবারে তু' মাসের ঘাস আনিয়ে দিতে হবে, না হলে আসছে 'সিজ্‌নে' (season) ঘোড়াটাকে দৌড় করাতে পারবো না।

—আরে, সে কি আবার একটা কথা হোল বাবাজী, টাকা আমি কালই পাঠাবো তোমার নামে।

সেই সপ্তাহেই সরোজ মনি অর্ডারে আরো তিনশো টাকা পাইল।

শ্বশুরমশাই এদিকে প্রতি রবিবারেই উলুবেড়িয়া হইতে আসিয়া খোঁজ লন—ঘোড়াটা কেমন হোল বাবাজী, একবার দেখাবে না?

সরোজ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়—আজ্ঞে, এখন ঘোড়াটা সাহেবদের আস্তাবলে আছে, কী করে রেসে দৌড়োতে হয় তাই শিখছে সেখানে।

—কেমন হোল একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

—সে যা হয়েছে—আপনি আর চিনতে পারবেন না, ফাঁকীম্পংয়ের ঘাস খেয়ে তার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ওদের অনুমতি নিয়ে সুবিধেমতো একদিন আপনাকে নিয়ে যাবো দেখবেন।

—তা আজই একবার চলো না বাবাজী?

—তা হয় না। ওদের সব নিয়ম-কানুন আছে, যখন তখন গিয়ে দেখতে চাইলে ওরা বিরক্ত হয়, হয়তো বলে বসবে, আপনাদের মতো লোকের ঘোড়া আমরা রাখবো না, তখন একবার ঘোড়া দেখতে গিয়ে আখেরের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করা ঠিক হবে কি, আপনিই বলুন?

—না না বাবা, তবে থাক্, তবে এখন থাক্!

শ্বশুরমশাইয়ের ব্যস্তভাব দেখিয়া সরোজ মনে মনে হাসিয়া লইল।

এদিকে পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, সরোজ স্ত্রীকে একদিন বলিল—এবার পূজায় কলকাতায় থাকবো না, পশ্চিমে ক'দিন ঘুরে আসিগে চলো।

স্ত্রী যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সাজাহানের প্রেমের মর্মর স্মৃতি দেখিবার তাহার আবাল্যের আগ্রহ। বলিল—আগ্রা নিয়ে যাবে তো?

সরোজ বলিল—হ্যাঁ, দিল্লী আগ্রা—সব!

—গত পূজায় বললে, টাকা কোথায় পাবো, আর এবার হঠাৎ এতো টাকা পেলে কোত্থেকে গো ?

—তোমার বাবা দিয়েছেন।

—বাবা টাকা দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ। কেন, তিনি কি দিতে পারেন না ?

—তা পারেন, কিন্তু আদায় করাটাই শক্ত। সত্যি দিয়েছেন, না দেবে বলেছেন ?

—দিয়েছেন, আমি আদায় করতে জানি বলেই, দিয়েছেন !

—কতো ?

—পাঁচশো।

—পাঁচশো ?

—হ্যাঁ।

—কি করে আদায় করলে ?

—দিল্লী-আগ্রা দেখবো বলে।

—অতো সহজে দেবার লোক তিনি নন্, সত্যি বল না কি করে আদায় করলে ?

—সত্যিই বলছি, অবিশ্বাস হয়, তোমার বাবাকে একখানি চিঠি লিখো তাহলেই সব জানতে পারবে। এই যে প্রায়ই এক টাকা দু' টাকা করে ধার নিতেন না, তারই প্রায় চারশো টাকা হয়েছিল, তার উপর একশো টাকা দিয়ে উনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, আচ্ছা এই রবিবারে এলেই সব জিজ্ঞেস করবো এখন।

—তাহলে আর জিজ্ঞেস করা হবে না, এই রবিবারে আমরা থাকবো আগ্রায়। কালই আমরা যাচ্ছি।

—কালই ?

—হ্যাঁ।

পরদিন সরোজ ট্রেন ধরিবার আগে শ্বশুরমশাইকে চিঠি লিখিল—

পূজ্যপাদেষু

আপনাকে দেখাইবার জন্য কাল সাহেবী আস্তাবল হইতে ঘোড়াটিকে আনাইয়া পাশের বাড়ির আস্তাবলে রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ফাঁকীস্পংয়ের ঘাস খাইয়া ঘোড়াটি এতো তেজী হইবে তা তো জানিতাম না। শেষ রাত্রে দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে। লোক পরম্পরায় খবর পাইলাম, শেরসাহ্ রোড্ ধরিয়া ঘোড়াটি ছুটিতেছে। অতো খরচ করার পর ঘোড়াটি যদি হারাইয়া যায় তাহা হইলে সমূহ ক্ষতি হইবে, তাই আর দেরি না করিয়া আমি তাহার অনুসরণে যাইতেছি। আপনার মেয়েকেই বা কাহার কাছে রাখিয়া যাই, তাই সঙ্গে লইলাম। পরে যথাযথ পত্রে সব লিখিব। এখন অত্যন্ত তড়াতাড়ি। প্রণাম লইবেন। ইতি—

সরোজের চিঠি পড়িয়া রাজেনবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে আরেকখানি চিঠি তাহার হাতে পড়িল, মেয়ে লিখিয়াছে—

বাবা! আপনি আমাদের পূজার খরচ হিসাবে পাঁচশো টাকা ধার শোধ দিয়েছেন শুনলুম। সেই টাকায় আজই আমরা পশ্চিমে যাত্রা করছি, দিল্লী, আগ্রা, সব ঘুরে আসবো। আপনি আমাদের সঙ্গে কেন এলেন না, বুঝতে পারলুম না · ইত্যাদি।

—এই কয়লাইন পড়িয়া রাজেনবাবুর চোখের সামনে সর্ষে ফুল ফুটিয়া উঠিল। মাথায় হাত দিয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িলেন, ইস্, ঘোড়া রেস সব বুজরুকী! কী শয়তান!

শয়তান তখন কৃপণ শ্বশুরের পয়সায় চলন্ত ট্রেনের ইন্টার ক্লাশে বসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে!

বি-বি-শ্রী

সাধারণ সম্পাদক দোস্তি কমরেড হঠাৎ একদিন পার্টির সাধারণ সভা ডেকে বসলো।

পপ্-পার্টির সাধারণ সভা দৈবাৎ বসে। একটা কোনো অঘটন না ঘটলে এ ধরনের সাধারণ সভা ডাকা হয় না। কাশীপুর থেকে যাদবপুর এবং বেলেঘাটা থেকে বেহালা পর্যন্ত বিস্তৃত কলিকাতা শহরের সকল সদস্যের একদিন সন্ধ্যাবেলা এই সভায় আসা কয়েক হাজার টাকা লোকসানের ব্যাপার। বিকাল চারটে থেকে রাত ন'টা অবধি পপ্-পার্টির সদস্যদের কাজের সময়। চারটে থেকে ট্রাম-বাসে ভিড় হতে শুরু হয়। সেই ভিড় চলতে থাকে সিনেমায় ইভ্‌নিং-শো শেষ হওয়া অবধি। কলেজের ছেলেদের পকেটে থাকে দামী ফাউন্টেন পেন, আপিসের লোকদের থাকে মনিব্যাগ, দোকানদারদের ফতুয়ার পকেটে থাকে নোটের তাড়া। 'পকেট পরিষ্কারক সমিতি' সংক্ষেপে পপ্-পার্টির সদস্যেরা ভিড়ের মধ্যে প্রত্যেকটি পকেট পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকে এবং যে পকেটটি ভারী বলে মনে হয় সেই পকেটটিকে হাল্‌কা করে দেয়। কয়েক সেকেণ্ডের পরিশ্রমে দু-চার টাকা থেকে দু-চার শ' টাকা পর্যন্ত উপার্জন হয়। এই উপার্জনের উপর কোনো আয়কর নেই, হস্তান্তরের সময় কোনো বিক্রয় কর নেই। বিনা মূলধনে কলিকাতায় এতো বড় চালু ব্যবসাও আর নেই। ছুটির দিনে ও পূজা-পার্বণের দিনে এই ব্যবসায়ে আশাতিরিক্ত লাভ হয়। একটি সন্ধ্যা নষ্ট করার মানে পকেট পরিষ্কারক সমিতির এক বিরাট ক্ষতি।

কিন্তু ক্ষতি হলে কি হয়, দোস্তি কমরেডের নির্দেশ মানতেই হবে। কমরেডের শৃংখলা-নীতি বড় কঠোর। যে নির্দেশ মানবে না, তার এলাকায় অনুগত লোককে পাঠিয়ে কমরেড তাকে বেকার

করে দেবে। রুজি রোজগারের পথ বন্ধ করতে কে চায়? সকল সদস্যই দোস্তি কমরেডের বেহালার বাগান বাড়িতে সমবেত হলো।

মস্ত বাগানওলা বাড়ি। ভিতরের দিকে চওড়া বারান্দা। সেই বারান্দায় রীতিমতো সভা বসে গেল। দোস্তি কমরেড সভা ডাকার ভূমিকাটুকু বললো। সে বললো—বন্ধুগণ, আমি আজকে আপনাদের এই সভা ডেকেছি, তার কারণ আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই সর্বত্রই সাংস্কৃতিক উন্নতির দিকে একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আজকের মানুষ বুঝতে পেরেছে দিনরাত রুজি রোজগারের ধান্দা করতে করতে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, কেবল পয়সা-পয়সা করে মানুষ বাঁচতে পারে না, জীবনে একটু আনন্দ চায়, সংস্কৃতি সেই আনন্দটুকু দেয়। আমাদেরও একটা সাংস্কৃতিক দিক থাকা দরকার। আপনারা কি বলেন?

—নিশ্চয়! নিশ্চয়!—সবাই সমস্বরে সাড়া তুললো।

দোস্তি কমরেডের কথায় সাড়া দিতেই হবে। কারণ পকেট পরিষ্কারক সমিতির এতো বড় মুরুব্বি আর নেই। ফাউন্টেন পেন, হাত ঘড়ি, কানের মাকড়ি, গলার হার যে যখন যা নিয়ে আসে, দোস্তি কমরেডের কাছে তখনই তার অর্ধেক দাম নগদ পাওয়া যায়। নয়া পয়সা পর্যন্ত হিসাব করে দেয়, কোনো ফাঁকি নেই। তাছাড়া পুলিশ যখন কারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে, তখন থানা ও আদালতে সে-ই তার মামলার তদ্বির করে। এমন মানুষকে অকারণে চটিয়ে দিয়ে লাভ কি?

দোস্তি কমরেড বললো—সংস্কৃতির কথা বলতে হলেই আমাদের ঐতিহ্যের কথা বলতে হয়। অনেকে মনে করেন আমাদের এই পকেট পরিষ্কারক প্রচেষ্টা আধুনিক কালের ব্যাপার। তা নয়। আমাদের দেশের বহু প্রাচীন এই পদ্ধতি। আর্যেরা ভারতে আসার আগে থেকে এই কর্মধারা চলছে। শিব ছিলেন অনার্যদের দেবতা। আর্যেরা সেইজন্য তাকে দেবাদিদেব বলেন! সেই আদিদেবের যে

নটরাজ মূর্তি আমরা দেখি, তাঁর ডান হাতে একটি মুদ্রা দেখা যায়। দুটি আঙুল, তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একসঙ্গে ধরা আছে। এরই নাম হচ্ছে মুদ্রা, আঙুলের ওই ভঙ্গী ও নাম একত্র যুক্ত করলেই বোঝা যায় যে, ওটি পকেট থেকে মুদ্রা তুলে নেওয়ার পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়। নটরাজের মূর্তির যথাযথ ব্যাখ্যা করলে এই অর্থ হয় যে, যদি মনের মতো মুদ্রা লোকের পকেট থেকে তুলে নেওয়া যায় তাহলে আপনা থেকেই নাচতে ইচ্ছা করে। এ হোল মানুষের সহজাত অনুভূতি। আমাদের মধ্যে যিনি মাসকাবারে কোনো আপিসের বড়বাবুর পকেট থেকে পাঁচ শ' টাকার মনিব্যাগটি তুলে নিতে পারেন তাঁর কি নাচতে ইচ্ছা করে না, আপনারা বলুন ?

—নিশ্চয়ই স্যার, নিশ্চয়ই !

…শুধু দেবাদিদেবের কথাই নয়, ভগবান বুদ্ধের কথায় আসুন। তাঁরও ডানহাতে ওই এক ভঙ্গী। অর্থাৎ তাঁর সময়েও এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। টাকা হাতে এসে পড়লেই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আদ্দির পাঞ্জাবি, দিশি কাপড়, পালিশ করা জুতো, চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনার ঘড়ি, পকেটে সোনার কলম, জামায় সোনার বোতাম যে সংস্কৃতিবান মানুষের পরিচয় দেয়, তার পকেটে টাকা আছে। যার সেই টাকা নেই, যে ময়লা কাপড় পরে, তার যতোই বিদ্যেবুদ্ধি থাক্ বাইরের সংস্কৃতি বজায় থাকে না। টাকা থাকলেই সংস্কৃতি। বৌদ্ধ যুগ অবধি আমাদের হাতে টাকা ছিল, তাই আমাদের সংস্কৃতিও তখন বড় ছিল। তারপর এলো পাঠান-মুগল ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল। লুঠ-তরাজ ও গুণ্ডামির ভয়ে মানুষ তখন কাছে টাকা রাখতো না, গায়ে গহনা পরতো না। পকেট পরিষ্কারক সমিতির রোজগার বন্ধ হয়, প্রাচীন সংস্কৃতিও লুপ্ত হতে বসে। বৃটিশ আমলে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে আবার মানুষ টাকা-পয়সা পকেটে রাখতে লাগলো আবার মেয়েরা কানে মাকড়ি, গলায় হার পরে পথে বেরুতে

লাগলো, আমাদেরও বেকারত্ব ঘুচলো, আবার তাই সংস্কৃতির কথা উঠেছে।

দোস্তি কমরেড একটু থামলো, আধ গ্লাস জল পান করে আবার শুরু করলো—নটরাজ ও বুদ্ধদেব দুজনেই আমাদের স্নেহ করতেন, সে তাঁদের ভঙ্গিমা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। তবু সাধারণ মানুষ আমাদের কাজের কোনো সম্মান দেয় না। অথচ এতো বড় ব্যক্তি-শিল্প আজ অবধি গড়ে ওঠেনি। একক মানুষের কয়েক সেকেণ্ডের কয়েকটি আঙুলের কাজ, কিন্তু কি তার উপার্জন! পরিশ্রমের এতো বেশি মূল্য আর কোনো শিল্পে পাওয়া যায় না। অথচ এ শিল্পের কোনো মর্যাদা নেই। কিন্তু অন্যে মর্যাদা দেয় না বলে কি আমরা নিজেরাও নিজেদেরকে মর্যাদা দেব না? মর্যাদা না পেলে এই শিল্পে শিল্পীরা উৎসাহ পাবে কেমন করে? আমি তাই প্রস্তাব করতে চাই যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি একটি উপাধি দেবো। শ্রী কথাটা আগে লোকের নামের গোড়ায় বসতো, আমরা স্বাধীন হবার পরে এটি উপাধির শেষে বসিয়ে সম্মান বোঝানো হচ্ছে। গভর্নমেণ্ট গুণীজনকে দিচ্ছে পদ্মশ্রী, বড় গায়ককে দেওয়া হচ্ছে গীতশ্রী, বড় ব্যায়ামীকে দেওয়া হচ্ছে ভারতশ্রী, আমরাও আমাদের শ্রেষ্ঠজনকে দেব বি-বি-শ্রী। আমরা যে কৌশলের চর্চা করি তাকে বলা চলে বিশেষ বিদ্যা, তা থেকে হলো বিশেষ-বিদ্যা-শ্রী, সংক্ষেপে বি-বি-শ্রী। এতে আমাদের মধ্যে গুণীর সম্মান করা হবে, গুণের আদর হবে। আপনারা কি বলেন?

—বেশ কথা! বেশ কথা!

গণেশ দাস দলের একজন প্রবীণ ব্যক্তি। এক সময় পকেট পরিষ্কার করে সে যথেষ্ট উপার্জন করেছে। এখন সে বেলেঘাটায় একটা বড় বস্তির মালিক। কাজ সে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু দল ছাড়েনি। সে বললো—কিন্তু কে যে সেরা সে পরীক্ষা হবে কি করে?

দোস্তি বললো—সে কথা আমি ভেবেছি। কে কি বুদ্ধির কাজ করেছে, সে সেই কথা বলবে, তা থেকেই আমরা বিচার করবো।

—সবাই বলবে? তাহলে তো অনেক গল্প, একদিনে তো ফুরুবে না!

—একদিনে সবাই বলবে কেন? এক একদিন এক একজন বলবে। দু মাস চার মাস ছ মাস ধরে চলবে। একটা বড় প্রতিযোগিতা, একি দু-একদিনের ব্যাপার!

—কিন্তু রোজ সন্ধ্যেবেলা আমরা এখানে বসে বসে গল্প শুনবো? তাহলে রোজগার করবো কখন?

—সবাই গল্প শুনবে কেন? একজন বিচারক হবে, সে-ই সব শুনবে।

গণেশ বললো—আমাকে তাহলে বিচারক কর, আমার তো সন্ধ্যেবেলা কোনো কাজ নেই, গাঁজা খাবো আর গল্প শুনবো।

—ঠিক আছে, তুমিই বিচারক। সবাইকার সব গল্প শুনে তুমি তিনটি গল্প বেছে নেবে। সেই তিনটি গল্প সভার মাঝে আমরা সবাই শুনবো। তার মধ্যে ভোটে যে ফার্স্ট হবে, সেই হবে বি-বি-শ্রী।

সবাই বললো—হ্যাঁ, এটা ভালো কথা, আমরা রাজী আছি।

সেইখানেই সভার কাজ শেষ হলো, গণেশের কাজ শুরু হলো। গণেশদা সন্ধ্যাবেলা বেলেঘাটার বাড়িতে বসে গাঁজা খায় আর গল্প শোনে। পপ্-পার্টির সদস্যসংখ্যা যতোই হোক, গল্প-বলিয়ের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি হয় না। এক মাসের মধ্যে গল্পের আসর শেষ হলো। তার মধ্যে গণেশদা তিনটি গল্প মনোনীত করলেন। দোস্তি কমরেড আবার এক সভা ডাকলো, সেই সভায় তিনজন সদস্য নিজের নিজের গল্প বললো।

প্রথম গল্প বললো—রণজিৎ দাস।

আমার শাশুড়ীঠাকরুণের হাতে অনেক পয়সা। শ্বশুরমশাই তেজারতি কারবার করতেন, প্রচুর টাকা রেখে গেছেন। কিন্তু হলে কি হয়, শাশুড়ীঠাকরুণের হাত থেকে জল গলে না। বলেন—পরে তো মেয়েরাই সব পাবে, এতো তাড়াতাড়ি কিসের ?

পয়সাওলা মানুষের খাতির করতে হয়, আমিও শাশুড়ীঠাকরুণের খাতির করি, শুধু খাতিরও নয়, ফিকির খুঁজি কিভাবে কিছু টেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তিনি এমনই মানুষ যে, কোনো দিক থেকে কোনো সুবিধা করতে পারি না।

ইতিমধ্যে সর্বোদয় যোগ এলো। শাশুড়ীঠাকরুণ চিঠি লিখলেন তিনি কলকাতায় আসছেন গঙ্গাস্নান করতে, আমি যেন হাওড়া স্টেশনে থাকি। হাওড়া স্টেশনে এসে দেখি ঠাকরুণের সঙ্গে কিছুই নেই, শুধু একটা পুঁটলি ছাড়া। একটু অবাক হলাম। এই একটিমাত্র পুঁটলি সম্বল করে তিনি বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে এলেন কি করে ? তাহলে কি, যে পয়সা আছে বলে শুনেছিলাম সে-সব বাজে কথা ? শুধু গুজব ?

কিন্তু পুঁটলিটা তুলতে গিয়ে দেখি বেজায় ভারী। শাশুড়ী-ঠাকরুণ হেসে বললেন—ওর মধ্যে আমার একটা বাক্স্ আছে। ট্রেনে বড্ড চুরি হয়, তাই পোঁটলার মধ্যে নিয়ে এসেছি, কারুর নজরে পড়বে না।

তাহলে পোঁটলায় মাল-কড়ি আছে জেনে মনটা খুশি হলো। যতো ভারীই হোক বইতে আর কষ্ট হলো না।

সেই পোঁটলার পানে তাকিয়ে ক'দিন তো ঠাকরুণের সেবায় লেগে গেলাম। ঠাকরুণ কালীঘাটে গেলেন, গঙ্গাস্নানে গেলেন, কিন্তু সব সময় চাবির গোছা আঁচলে বাঁধা। চাবি ঠাকরুণের সঙ্গে সঙ্গে। আমি যে বাক্সটা খুলে কিছু বাগিয়ে নেবো সে সুবিধা আর হয় না।

একদিন বললাম—ঠাকরুণ, বায়োস্কোপ দেখেছেন? ছবিতে কথা বলে।

ঠাকরুণ বললেন—শুনেছি, কিন্তু দেখিনি, ওসব আর আমার এখন ভালো লাগে না।

—কিন্তু একখানা নতুন ছবি এসেছে, আপনার ভালো লাগবেই। রামায়ণ—ভরত-মিলাপ।

—রামায়ণ?

—হ্যাঁ, রামচন্দ্রের বনগমন, ভরতের খড়ম এনে পূজা করা, এই সব আর কি!

—ধর্মের বই যখন, তা দেখতে পারি।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। বইখানি হচ্ছে শ্যামবাজারের এক সিনেমা হাউসে। শাশুড়ীঠাকরুণকে নিয়ে সেইদিন বিকালে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু বাসে উঠেই বেধে গেল এক হাঙ্গামা।

কণ্ডাক্‌টর ভাড়া চাইল, পয়সা দিচ্ছি, ঠাকরুণ বললেন—কতো দিচ্ছ?

—ছ' আনা।

—ছ' আনা কিসের?

—দুজনের তিন আনা করে?

—দরদাম করে দাও, তিন আনা চাইলেই তিন আনা দিতে হবে?

—এই রেট্।

—কিসের রেট্? কলকাতায় তোমরা বাবু হয়ে গেছ, তাই দরদাম করতে তোমাদের লজ্জা করে। গাঁয়ে আমরা দরদস্তুর করি, দুচার পয়সা কমে যায়। দাও দিকি পয়সাটা আমার হাতে।

আমার হাত থেকে ঠাকরুণ পয়সাটা ছিনিয়ে নিলেন। কণ্ডাক্‌টরের হাতে একটা সিকি দিয়ে বললেন—দাও দুখানা টিকিট।

—কোথায় যাবেন?

—শ্যামবাজার। আমি বললাম।

—কালীঘাট থেকে আসছেন তো, আর ছ আনা দিন।

—এ কি একটা কাজের কথা হলো, রোজ যাচ্ছি ছ' আনায় আর আজ তুমি নেবে তিন আনা!

কণ্ডাক্টর হেসে বললো—নতুন এসেছেন বুঝি, কলকাতায়?

—নতুন পুরোনোর কি আছে? একটা ন্যায্য কথা বলবে তো?

—বেশি কথা বলার সময় নেই, পয়সা দিন।

—বেশ, দশ পয়সা করে নাও, তোমার কথাও থাক্ আমার কথাও থাক্।

আশে-পাশের সবাই শুনছিল, এবার সবাই হেসে উঠলো।

লজ্জিত হলাম, বললাম—ওকে ছ' আনাই দিন।

—ছ' আনাই দিতে হবে? তাহলে নেমে যাব!

কণ্ডাক্টর বললো—এতোটা এলেন, এর ভাড়া দিয়ে নেমে যান!

ঠাক্রুণ এবার বেকায়দায় পড়লেন, ছ' আনা পয়সা দিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন—এ তোমাদের ভারী অন্যায় বাপু, তিন আনা বললে তো তিন আনাই দিতে হবে!

টিকিট দিয়ে কণ্ডাক্টর এগিয়ে গেল, আশ-পাশের লোকগুলো তখনও হাসছে দেখে ঠাক্রুণ বললেন—মুখপোড়াদের মুখে আর হাসি ধরে না। তোরা ঠকছিস বলে কি আমাকেও ঠকতে হবে! দরদাম নেই?

মুখ বুজে বসে থাকা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। চুপ করে বসে রইলাম।

সিনেমার সামনে নেমে দেখি অন্য বই হচ্ছে। কালকের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, আজই বই বদলে যাবে, তা তো খেয়াল ছিল না। কি করি? ঠাক্রুণকে সিনেমায় না ঢোকাতে পারলে তো আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। চোখ-কান বুজে টিকিট তো কিনে

ফেললাম। দোতলায় মেয়েদের আসনের দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে বললাম—আমি নীচে আছি, বই শেষ হলে নেমে যাবেন। আর আপনার ওই চাবিটা আঁচলে বেঁধে রেখেছেন ওটা আমাকে দিন, এখানে অন্ধকারে কেউ যদি খুলে নেয় তো আপনার বাক্স্ খোলাই বন্ধ হয়ে যাবে।

—চাবি কে খুলে নেবে, চাবি খুলে নিয়ে তার কি লাভ হবে ?

—কে খুলে নেবে আমি কি করে বলবো ? তবে এখানে এক একটা তালার চাবির দাম আট আনা করে। বাক্সের চাবি এক এক টাকা। আপনার চার পাঁচটা চাবি খুলতে পারলেই তার তিন-চার টাকা রোজগার হয়ে যাবে। নিজের সাবধান নিজের কাছে।

—কলকাতা এক মহা-বাটপাড়ের জায়গা বাপু—বলে ঠাক্রুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাবির গোছাটা খুলে দিলেন। আমিও নীচে নেমে এলাম।

তখনি একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম। বাড়ি পৌঁছে চাবি দিয়ে ঠাক্রুণের বাক্স্ খুললাম। গোছা গোছা এক টাকার নোট সুতো দিয়ে বাঁধা। বাক্স ভর্তি। তা চার-পাঁচ হাজার টাকার মতো হবে। মনে হলো সবটাই নিই। কিন্তু স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই বেশি নিতে দিল না। শেষ অবধি পাঁচ শ' টাকা বের করে নিয়ে বাক্স বন্ধ করতে হলো। তারপর আবার ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম সিনেমায়।

সিনেমা শেষ হলে ঠাকরুণ নেমে এলেন। চাবির গোছা ফিরিয়ে দিলাম। ঠাকরুণ বললেন—খুব রামায়ণ দেখালে বাবা, গল্পের মাথা মুণ্ডু তো কিছুই বুঝলাম না। রামায়ণ তো তিনচার বার পড়েছি, কোথায় বা সেই অযোধ্যা আর কোথায় বা সেই পঞ্চবটি! অযোধ্যা দেখালো একটা মস্ত শহর আর পঞ্চবটি দেখালো একটা গাঁ। সীতা গাছের নীচে নাচছে, আর রাম সিগারেট খাচ্ছে। তোমাদের রামায়ণ তোমাদেরই থাক্!

—এ যে আজকালকার রামায়ণ। সে অযোধ্যা তো এখন মস্ত শহর হয়ে গেছে। সেই রামচন্দ্র আজ বেঁচে থাকলে কেমন হতেন তাই দেখালে।

—রামায়ণ আবার আজকালকার কি? গল্পটা তো সেই গল্প হবে। রাম সিগারেট খাবে, সীতা নাচবে—এ কি রামায়ণ হলো?

চারিপাশের লোক তাকিয়ে দেখছে, বললাম—বাড়ি গিয়ে আপনাকে আমি সব বুঝিয়ে দেব, এখন চলুন।

বাসে উঠে পড়লাম।

রণজিৎ গল্প শেষ করলো, বললে—এই পাঁচ শ' টাকা আমার জীবনে স্পেশ্যাল রোজগার। এতো সহজে এতো টাকা আমি আর কখনও পাইনি। যার নিয়েছি সে টেরও পায়নি।

দ্বিতীয় গল্প বললো শংকর বসু।

জাপানী আপিসে চাকরি করতাম। যুদ্ধ বাধলো, আপিস উঠে গেল। চাকরি গেল, কিন্তু পেটের খিদে তো আর গেল না। কি করে চলবে মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম। একবার মনে হলো যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়ে দিই, কিন্তু তখনই আবার মনে হলো, কার জন্যে লড়তে যাব। গুলি খেয়ে কি বোমা ফেটে আমার প্রাণটা যাবে, আর এখানে যারা মোটর চড়ে ঘুরছে আর সিনেমা দেখছে, তারা ঠিকই মোটর চড়বে আর সিনেমা দেখবে। প্রাণ বাঁচাতে গিয়েই বেঘোরে প্রাণান্ত হবে। কিন্তু টাকা তো চাই, করি কি?

দুপুরে আপিসে আপিসে ঘুরে বেড়াই। ক্লান্ত হয়ে গড়ের মাঠের গাছতলায় গিয়ে বসে থাকি।

একদিন দেখি এক গাছতলায় বসে নিবিষ্ট মনে একটি লোক রেসের বই দেখছে। হাতে তার দুটি সোনার আংটি, সোনার হাতঘড়ি, পকেটে দামী কলম। রেস খেলে অনেকে ভালো

রোজগার করে বলে শুনেছিলাম, ইনি হয়তো তাদেরই একজন। গিয়ে বসে পড়লাম তাঁর পাশে, বললাম—কিছু ঠিক করতে পারলেন ?

আমার মুখের পানে না তাকিয়েই ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আমার করাই আছে, তবু একবার মিলিয়ে নিচ্ছি।

—কি ঠিক করলেন তবু একটু শুনি।

ফার্স্ট রানে 'কাশ্মীর পিন্সেস' ফার্স্ট হবে। সেকেণ্ড রানটায় একটু গোলমাল হচ্ছে, ছুটো ভালো ঘোড়া আছে, ওটায় আর 'উইনে' খেলবো না, ওটা 'প্লেসেই' খেলবো।

—প্লেসে খেলবেন কেন ? যা খেলবেন উইনে খেলবেন। আমি ঠিক করে দেবো। আমার ঘোড়া উইন করবেই।

—কোন্ ঘোড়া ?

—বেতো ঘোড়া। লাস্ট ঘোড়াকে আমি ফার্স্ট করাবো। অ্যাটমিক এনার্জিতে ঘোড়া উড়ে চলবে। রাশিয়ান রকেটের মতো ছুটবে।

—কি রকম ? ভদ্রলোক এবার মুখ তুলে আমার পানে তাকালেন, বললেন—ঠিক তো বুঝলাম না !

—বোঝবার কিছু নেই, এ শুধু দেখবার ও দেখাবার, আমি এই নিয়ে রিসার্চ করেছি, এখনও করছি। আমি দেখাবো, আপনি দেখবেন। কিন্তু খবরদার একথা এখন বাইরে প্রকাশ করবেন না।

—কিন্তু ব্যাপারটা কিছু তো বুঝলাম না ?

—অ্যাটনিক এনার্জি বোঝেন ? আণবিক শক্তি ? মানে শুধু স্পীড, ত্বর্বার বাধাহীন গতি। যে গতিতে সূর্য ছুটছে, পৃথিবী ঘুরছে, গ্রহ-নক্ষত্র চলছে। সেই গতি। সেই গতিকে প্রয়োজনমতো কেটে নিতে হবে, আপনার যতোখানি দরকার ঠিক ততোখানি নিয়ে কাজে লাগাতে হবে। এক মাইল এনার্জি একটা ছুটন্ত ঘোড়ার গায়ে ছুঁড়ে মারুন, ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া পক্ষীরাজের মতো এক

মিনিটে এক মাইল চলে যাবে। লাস্ট ঘোড়া রেসকোর্সে ফার্স্ট হয়ে যাবে। আমি এক্সপেরিমেন্ট করেছি, আপনাকে দেখাবো। আপনি কতোদিন রেস খেলছেন ?

—তা দশ-বারো বছর।

—তাহলে তো আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, আপনি জানেন, লাস্ট ঘোড়া কখনও ফার্স্ট হয় না। কিন্তু আমি আপনাকে দেখাবো লাস্ট ঘোড়া ফার্স্ট ঘোড়াকে এক শ' গজ পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। দেখলেই আপনি বুঝবেন।

—কি ব্যাপার বলুন তো ?

—আজই সন্ধ্যেবেলা আসুন, আমি দেখিয়ে দিই। দিনের বেলাতেই দেখাতে পারতাম তবে অনেকের নজরে পড়ে যাবে, তাই রাত্রে দেখাতে চাই। সে দেখলে আপনাকে আর ঘোড়া বাছতে হবে না। আপনার ঘোড়াই ফার্স্ট হবে।

—বেশ, আমি আসবো, সন্ধ্যেবেলা এইখানে।

বাড়ি ফিরলাম। একটা কাচের সিরিঞ্জ কিনে, আগাগোড়া তুলো জড়িয়ে সুতো দিয়ে বাঁধলাম। তারপর সেইটি পকেটে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা গড়ের মাঠে গেলাম। একা আসিনি। পাড়ার একটা ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাকে একটা গাছতলায় বসিয়ে রাখলাম, বললাম—আমি তোর পিছনে দাঁড়িয়ে যখন বলে উঠবো—'গো !' তখনই তুই লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করবি। বরাবর দৌড়ে চলে যাবি একেবারে ট্রাম লাইন অবধি। তারপর ট্রামে করে বাড়ি চলে আসবি। পরে বাড়ি ফিরে এসে আমি তোকে পাঁচটা টাকা দেব।

ঘাসের উপর বসে আছি, একটু পরেই দেখি রেসের বই হাতে নিয়ে ভদ্রলোক আসছেন।

ডেকে বললাম—বসুন।

তারপর পকেট থেকে সিরিঞ্জটা বের করে দেখালাম, বললাম—

এ দেখে এর কিছুই বুঝবেন না, এর মধ্যে সিকি মাইল এনার্জি ভরা আছে। মাইলড্ এনার্জি, অর্থাৎ কি না কম জোরালো। কারণ এটা আমি মানুষের উপর পরীক্ষা করবো, ঘোড়ার উপর তো নয়। স্ট্রং এনার্জি হলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে মানুষটা শেষে বাস-ট্রামের সামনে পড়ে একটা অ্যাকসিডেন্ট করে বসবে।

ভদ্রলোকের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠলো। বললাম—বুঝতে পারছেন না তো, যার কাছে গিয়ে এই পিচকারি টিপবো সেই এক ধাক্কা খাবে—এনার্জির ধাক্কা। সেই ধাক্কা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ছুটিয়ে নিয়ে যাবে সিকি মাইল, অর্থাৎ ৪৪০ গজ। সে জানবে না কিন্তু সে ছুটবে। ছুটবে সবার আগে। অ্যাটমিক এনার্জি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, সে টের পাবে না, বুঝতে পারলেও তার করার কিছু থাকবে না।

—বলেন কি?

—এই আমি বলি। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার উপর পরীক্ষা করেছিলাম, ঘোড়া ছুটেছিল পাগলের মতো। রেসের ঘোড়ার উপর পরীক্ষা করবো দেখবেন, ঘোড়া ছুটবে বিদ্যুতের মতো। এ শক্তি জগতের একটি বিস্ময়, আমার কুড়ি বছরের গবেষণার ফল। মাইলড্ এনার্জির কাজ আমি আপনাকে একটু দেখিয়ে দেব, আপনি চমকে উঠবেন। এই এতোটুকু সিরিঞ্জ, একটা মানুষকে সিকি মাইল দৌড় করাবে, আপনি দেখবেন, অবাক হয়ে যাবেন।

ভদ্রলোককে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সামনেই গাছের নীচে ছেলেটি বসে বসে চিনেবাদাম খাচ্ছিল, তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—দেখুন এবার ব্যাপার!

সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, বললাম—ওয়ান, টু, থ্রি—গো!

সিরিঞ্জটা টিপে দিলাম। ছেলেটিও লাফিয়ে উঠলো, তারপরেই তীরের মতো ছুটে চলে গেল সামনের দিকে। দেখতে দেখতে সে

চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমিও পিচ্‌কারিটা পকেটে ভরে ফেললাম। বললাম—দেখলেন তো? রেসের ঘোড়াও ছুটবে ঠিক ওই ভাবে। সে হবে স্ট্রং এনার্জি, বিদ্যুতের মতো ছুটবে!

ভদ্রলোকের বিস্ময় কাটতে একটু সময় লাগলো। তারপরেই আমাকে ধরে পড়লেন, বললেন—একবার এই এনার্জি ছাড়ার জন্য কতো খরচ পড়ে?

বললাম—খরচ খুব বেশি পড়ে না। কিন্তু একজন এম.এস্-সি-র বিশ বছরের খাটুনি এর মধ্যে আছে, জীবনের সেই সময়টার দাম চাই।

—দেব আমি দাম। প্রথমে আপনি খরচাটা নিন তারপর বাজী জিতে যা পাব, আপনার অর্ধেক। প্রথম খরচ কতো আমায় দিতে হবে বলুন?

—প্রথম খরচ অন্তত: ত্রিশ টাকা দিতে হবে আপনাকে।

—বেশ দেব, আপনি শনিবার আসুন রেসকোর্সে, এক নম্বর গেটের সামনে আমি থাকবো।

—ওর মধ্যে আমি নেই। আগে টাকা দেবেন। এনার্জি তৈরি করতে হবে, তারপর অন্য কথা।

—বেশ ত্রিশ টাকা তো? আমি কালই আপনাকে দিয়ে আসবো, আপনার ঠিকানা দিন।

—আমার বাড়ির ঠিকানা আমি আপনাকে দেব না। যখন তখন আপনি গিয়ে কাজের ব্যাঘাত করবেন সে হবে না। বরং আপনার বাড়ির ঠিকানা বলুন, আমি যাব।

ঘোড়া ফার্স্ট হবে, একথার পর জুয়াড়ীর যুক্তিতর্ক জ্ঞান থাকে না। ভদ্রলোক বললেন—বেশ, চলুন, এখনি আপনাকে বাড়ি থেকে টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক আমাকে ভবানীপুরে নিয়ে গেলেন। চা ও বিস্কুট

খাওয়ালেন এবং ত্রিশটি টাকা হাতে দিলেন। বললাম—শনিবারে এক নম্বর গেটে থাকবো, আরও কুড়ি টাকা আমার চাই।

সেই সিরিঞ্জ নিয়ে শনিবার আবার গেলাম। কুড়িটি টাকা হাতে নিয়ে বললাম—আপনার ঘোড়ার নম্বর কতো বলুন?

সে একটি নম্বর বললো। বললাম—আমি বেড়ার পাশে রইলাম, ঘোড়া যখন আমার সামনে দিয়ে যাবে, তখন মজাটা দেখবেন।

আমি বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ালাম, ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন। তারপর আমিও ধীরে ধীরে সরে পড়লাম।

শংকর এইখানেই গল্প শেষ করলো, বললো—কোনো ঝক্কি না পুইয়ে এতো সহজে আর কখনও আমি টাকা রোজগার করতে পারিনি।

এবার তৃতীয় গল্প শুরু করলো নরেন মল্লিক:

বাড়িওয়ালা আমার সঙ্গে মামলা জুড়ে দিল। আমি পুরোনো ভাড়াটে। আগের কম ভাড়ায় আছি, আমাকে তুলে দিতে পারলে সে অনেক বেশি ভাড়া পাবে। কিন্তু 'ছেড়ে দাও' বললেই আমি ছাড়ি কি করে? আমাকে মামলা লড়ার জন্যই তৈরি হতে হলো।

মামলা লড়ার খরচ আছে। খাওয়া-পরা সাধারণ খরচের উপর এটা হলো উপরি। উপরি খরচের জন্য উপরি রোজগার চাই। কোর্টের সমন পেয়ে সেই উপরি রোজগারের কথাই ভাবতে লাগলাম।

সমনটি লেখা ছিল পেনসিলে, রবার দিয়ে সব তুলে ফেললাম। তারপর সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে পড়লাম সমনখানা পকেটে নিয়ে।

তেমাথার মোড়ে বড় একখানি খাবারের দোকান। তার নাম-ঠিকানাটা পেনসিল দিয়ে সমনের উপর লিখে নিলাম। তারপর ঢুকে পড়লাম ভিতরে। বললাম—মালিক কোথায়?

সামনেই ক্যাসবাক্স নিয়ে মালিক বসেছিলেন, বললেন—কেন ?

—আপনার পুলিশ লাইসেন্স, কর্পোরেশন লাইসেন্স, সব দেওয়া আছে তো ?

—সে সব দিয়েছি বছরের গোড়ার দিকেই।

—যাক্, তাহলে আপনার জরিমানা কমই হবে।

—জরিমানা ? কিসের জরিমানা ?

—আপনি কিসের খাবার তৈরি করেন—ঘি না ডালদা ?

—ঘি পাব কোথায় ? কলকাতায় ঘি বলে কোনো বস্তু আছে ? সবই তো ভেজিটেবিল।

—তা হোক্, কিন্তু নতুন আইনে যে লিখে দিতে হয়, তা লেখেন নি কেন ? সামনে একটা বোর্ডে লিখে দিতে হবে যে, ঘিয়ের খাবার না ডালদার খাবার।

—কই তেমন তো কিছু শুনিনি।

—খবরের কাগজে নোটিশ বেরিয়েছিল, দেখেননি ?

—এ অঞ্চলে কোনো খাবারওলাই তো কিছু লেখেনি।

—এখন সব কোর্টে গিয়ে জরিমানা দিন। এই তো ন'খানা সমন ধরিয়ে এলাম। এই নিন আপনারটাও রাখুন।

—সমনটা তার হাতে দিলাম। বললাম— কাল কোর্টে যাবেন।

—সর্বনাশ, কালই কেস।

—কিছুই না, গিয়ে দাঁড়াবেন, একটা জরিমানা হবে, দিয়ে চলে আসবেন। সঙ্গে টাকা নিয়ে যাবেন।

—কতো টাকা জরিমানা হবে ?

—এ ম্যাজিস্ট্রেট বড় কড়া। টাকা পঞ্চাশের কম হবে না। ক'দিন তো দেখছি, বড় দোকান একশো, মাঝারি পঞ্চাশ, ছোট পঁচিশ। আপনার মাঝারি দোকান, আপনার পঞ্চাশ টাকা হবে।

—একেবারে পঞ্চাশ টাকা !

—কি হবে বলুন, আপনারা কাগজ পড়বেন না, বে-আইনি কাজ করবেন, জরিমানা দিতে হবে।

—কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় না ?

—ব্যবস্থা সবই করা যায়, টাকা খরচ করলেই ব্যবস্থা।

—কি রকম খরচ দিতে হবে বলুন তো ?

—গোটা পঁচিশেক তো বটেই, আর আজই একখানা সাইন বোর্ড লিখিয়ে ঝুলিয়ে দিন। ইন্‌স্‌পেকটার নিজেই তাহলে মামলা তুলে নেবেন। বলবেন—সব ঠিক হয়ে গেছে স্যার।

—ইন্‌স্‌পেকটারকে পাই কোথায় ?

—ফুড ইন্‌স্‌পেকটার আমার চেনা, চলুন তার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

—এই সন্ধ্যেবেলা দোকান ছেড়ে যাই কি করে ?

—নিজে না যান কোনো কর্মচারীকে আমার সঙ্গে দিন।

—ওরা তো কারিগর, তেমন চালাক-চতুর নয়, ওদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

—তাহলে যাবেন না ! কাল কোর্টে গিয়ে ফাইন দিয়ে আসবেন।

আমি বেরিয়ে আসছি, দোকানী বললো—সে কি, বসুন বসুন, একটু মিষ্টিমুখ করে যান, ওরে জল দে, সিঙ্গাড়া আর রসগোল্লা দে—

বসলাম, দুখানা সিঙ্গাড়া ও চারটে রসগোল্লা খেলাম।

দোকানী বললেন—টাকাটা যদি আপনার হাতে দিই, আপনি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না ?

এমনিই একটা কথার প্রত্যাশা করছিলাম, বললাম—আপনার কাজ আপনি নিজে করাই কি ঠিক না ?

—নিজে তো যেতে পারছি না।

—আপনি আমাকে টাকাটা দেবেন, আপনি আমায় চেনেন ?

—আপনি কোর্টের লোক সমন দিয়ে যাচ্ছেন আপনাকে অবিশ্বাস করার কি আছে ?
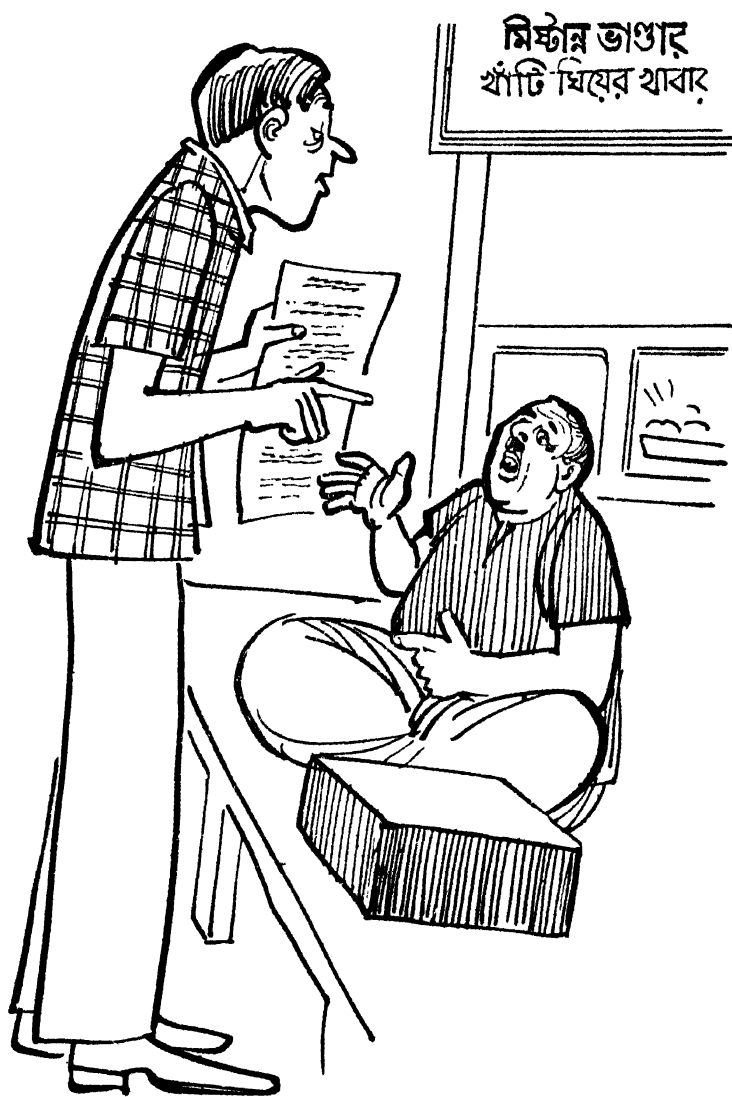
টাকাটা যদি আপনার হাতে দিই, সব ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

—বিশ্বাস যদি করেন তো দিতে পারেন, তবে আদালতে কাল আপনাকে যেতে হবে। ব্যাপারটা জেনে আসবেন।

দোকানী পঁচিশটি টাকা দিল, বাড়ির ছেলেমেয়েদের খাবার নাম করে এক কৌটো সন্দেশ দিল। আহার ও দক্ষিণা দুই নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে।

এ তো হলো হাতে খড়ি। এর পর যতবার আমি কোর্টের সমন পেয়েছি ততবারই কিছু-না-কিছু উপায় করে নিয়েছি। বাড়িওয়ালা মামলা করে আমার এক নতুন রোজগারের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। দু'বছর মামলা চলছে, আমি চাই আরো দুবছর চলুক।

নরেন মল্লিক এইখানেই গল্প শেষ করলো।

সভায় এবার ভোট নেওয়া হবে, কার গল্প সেরা। দোস্তি কমরেড বললেন—বিচার করতে হবে দুদিক থেকে, বিপদের ঝুঁকি, আর বুদ্ধি। প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পে বিপদের কোনো ঝুঁকি নেই, তৃতীয় গল্পে ধরা পড়ার বিপদ ছিল, কাজেই তৃতীয় গল্পটিই সেরা গল্প। বিপদ আছে, বুদ্ধি আছে।

সবাই বললো—ঠিক কথা।

দোস্তি বললো—প্রথম গল্পটি চুরি, দ্বিতীয়টি ঠকানো, আর তৃতীয়টি বুদ্ধি ও সাহসের গল্প।

সবাই বললো—ঠিক কথা।

দোস্তি বললো—তৃতীয়টিই সেরা, ওরই পুরস্কার পাওয়া উচিত এবং উপাধি পাওয়া উচিত ওরই।

রূপোর পদক গড়ানো ছিল। সভাপতি গণেশ দাশ নরেন মল্লিককে পদক দিল, আর তারই সঙ্গে দিল একশো টাকা পুরস্কার।

টাকা নিয়ে নরেন বেরিয়ে পড়লো। বাড়ি ফেরার পথে এক হোটেলে গিয়ে বসে গেল কাটলেট খেতে। খাওয়া শেষ করে পকেটে হাত দিয়ে দেখে একটি পয়সাও নেই। টাকা কি হলো?

শেষে পদকখানা বন্ধক রেখে নরেনকে বেরিয়ে আসতে হলো। সে ফিরে এলো দোস্তি কমরেডের কাছে, বললো—এ কি !

কমরেড হেসে বললো—এতোগুলো পকেট মারের মধ্যে থেকে কেউ কখনো টাকা নিয়ে বেরুতে পারে ? যে তোমার পকেট সাফ করেছে, সে তোমার চেয়ে চালাক, পদকখানা ফেরত দিও, ওটা তারই পাওনা, তাকেই দিতে হবে।

বীরেনের বিশ্ববিদ্যালয়

বীরেন অতো পড়েও এবার ফেল করলে।

বন্ধু জীবন বললে—তুমি সব জানলে কি হবে লিখতে পার না, লেখা বড় শক্ত ভাই, কলমের জোর সকলের থাকে না। দেখছ তো সকলেই লেখে কিন্তু কলমের জোরে শুধু একজনই রবীন্দ্রনাথ হোল, কলমের জোর বড় শক্ত ব্যাপার ভাই!

—কেন যে কলমের জোর তার হয় না, কেন যে সে লিখতে পারে না, তার যুক্তি সে খুঁজে পায় না। তিন তিনবার সরস্বতী পূজায় দেবীর চরণে সে কলম দিয়েছিল, সেই কলমে লিখেও সে এবার পাস করলে না। এ সরস্বতী কাজের নয়, ওরা ঠিক করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে পূজো করতে পারে না!

জীবন একটু বেশি বুদ্ধিমান, সে বললে, সরস্বতী ভাই ঠিকই আছেন, তবে তোমার আবেদন তাঁর কাছে ঠিক পৌঁছোয়নি। একটা দেবী বলে কথা, তাঁর চরণে একটি কলম দিয়ে পাঁচবার প্রণাম ঠুকলেই কি আর পাস করা যাবে? যোগ্য লোকের থ্রু দিয়ে সব কাজ করতে হয়। দেখ না, য়ুনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলারের কাছে কোনো চিঠি লিখলে হেড্ মাস্টারের থ্রু দিয়ে পাঠাতে হয়, রাজার কাছে আপীল করলে লাট সাহেবের হাত দিয়ে সে আপীল পাঠাতে হয়। মানুষের বেলাই যখন এমন নিয়ম-কানুন, তখন দেব-দেবীর বেলা হবে না?

—তাহলে কি করি এখন, আমার কলমের জোর কি করে হবে?

—আগে সরস্বতীর বরপুত্রকে ধর। তাঁর হাত দিয়ে সরস্বতীর কাছে কলম পাঠাও, দেখবে ঠিক পাস করবে—

—সরস্বতীর বরপুত্র কে?

—স্যার আশুতোষ তো অ্যাদ্দিন ছিলেন, এখন উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর ছেলে শ্যামাপ্রসাদবাবুকে তোমার ধরা উচিত, আর পরীক্ষার ব্যাপারে তিনিই যোগ্যতম লোক, কেননা তিনিই তো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব এগ্‌জামিনের কর্তা!

বীরেন এইবার ব্যাপারটা বুঝল।

পরদিন সকালেই সে ছুটল শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ি।

দোতলার একখানি ঘরে শ্যামাপ্রসাদবাবু বসেছিলেন। ছবিতে বহুবার সে-মুখ দেখেছে, চিনে নিতে বীরেনের দেরি হোল না, সামনে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালো।

শ্যামাপ্রসাদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই?

বীরেন কলমটি পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি বের করে সামনের টেবিলের ওপর রেখে বললে—আমার এই কলমটা সরস্বতীর আশীর্বাদ পাবার জন্য আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি!

এমন কথা শ্যামাপ্রসাদবাবু কখনও শোনেননি, বিস্ময়ে বীরেনের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—তার মানে?

—আজ্ঞে, সরস্বতীর আশীর্বাদ পেলে এই কলমটি দিয়ে ভালো লিখে আমি পাস করবো। আপনিই তো এখন সরস্বতীর বরপুত্র—য়ুনিভার্সিটির কর্তা, তাই আপনার থ্রু দিয়েই আমি সরস্বতীর কাছে আপীল জানাতে এসেছি।

শ্যামাপ্রসাদবাবু এবার বুঝলেন, বুঝে হাসলেন, বললেন,—এসব বাজে কথা তোমায় কে বলেছে, বাড়ি গিয়ে ভাল করে পড়গে, পাস করবে!

—আজ্ঞে, পড়তে আর কিছু বাকী রাখিনি। তিনবার পরীক্ষা দিলুম, কিন্তু কলমের জোর নেই বলে পাস করতে পারলুম না।

শ্যামাপ্রসাদবাবু বুঝিয়ে বললেন—দেখ, কলমের জোর সরস্বতীর আশীর্বাদে হয় না, এখন থেকে ভালো করে লেখা অভ্যাস কর, এবার পাস হয়ে যাবে!

—বেশ, তাই যদি হয় তো আপনার কলমটা দিন, ওইটায় আমি এবার লিখবো।

শ্যামাপ্রসাদবাবু একটি নতুন ভারতী পেন দিয়ে লিখছিলেন, ক'দিন আগে বাইশ টাকা দিয়ে কিনেছেন, সেটি বীরেনের মতো এক অচেনা-অজানা ছেলেকে কেন দেবেন? বললেন—তা' কি হয়, তুমি এখন থেকে লেখা অভ্যাস করগে, পরীক্ষা দিও, তারপর আমার কাছে এসো, দেখা যাবে—

—আপনি তাহলে কিছুই আমার জন্য করবেন না? বেশ! বলে গরগর করে বীরেন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাড়ি ফিরে সারাটি দিন বীরেন গুম্ হয়ে ঘরের মধ্যে বসে রইলো, শ্যামাপ্রসাদবাবুর উপর তার মন তখন ক্ষেপে উঠেছে। ওঁরই আমলে সে বারবার ফেল করছে, কলমটা পেলে তার জোরে যদি বা এবার পাস করতে পারতো তা'ও তিনি দিলেন না। য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার বলে তাঁর চাল বেড়ে গেছে। বহুৎ আচ্ছা! সে-ও ওই য়ুনিভার্সিটির তোয়াক্কা রাখবে না। য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রী না পেয়েও কি রবীন্দ্রনাথ কম নাম করেছেন? রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, চণ্ডীদাস ক'টি য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। বড় যদি হবার হয়, তো ম্যাট্রিক পাস না করলেও হবে, শ্যামাপ্রসাদবাবুর য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেট সে নেবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ-বাবুকে একবার জানিয়ে দিতে হবে তার নিজের যোগ্যতার কথা। এমন কিছু সে করবে, যা দেখে শ্যামাপ্রসাদবাবুর ঈর্ষা হবে, তার মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তোয়াক্কা রাখেনি দেখে শ্যামাপ্রসাদবাবুর দুঃখও বড় কম হবে না।

কিন্তু কি করবে ভেবে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু জীবনের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করে প্রথমে নিজের নামটি বীরেন বদ্‌লে ফেল্‌লে, একেবারে কামালপাশার ধরনে নামের পদবী তুলে দিয়ে করলে 'বেদানা-হিন্দ্'!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হোল—শ্রীবীরেন্দ্র বেদানা-হিন্দ্।

পরদিনই কলিকাতার পথে পথে পাঁচ হাজার বিজ্ঞাপন বিলি হোল।

ব্যায়াম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার অন্নসমস্যার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যসমস্যার কথা ভাববার দিন আজ এসেছে। বাঙালী আজ খেয়ে হজম করতে পারে না, সিধে হয়ে চলতে পারে না, চশমা না হ'লে দেখতে পায় না। আমাদের পূর্বের স্বাস্থ্য ও শক্তিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হ'লে, আমাদেরকেই সংঘবদ্ধভাবে সাধনা করতে হবে, গান্ধী, জওহরলাল কি সুভাষচন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে থাকলে আর চলবে না, আর এই সম্পর্কে তাঁদের বাণী দেবার মতো কিছু নাইও। গান্ধীজী তো নির্জীব মানুষ, ছাগলের দুধ হজম করেন তা'ও লেবুর রস খেয়ে। জওহরলালের হাতের গুলির ছবি কোনো কাগজে বেরোয়নি, চোখেও কেউ দেখেনি। আর সুভাষচন্দ্র বেচারা তো অসুখের সঙ্গে একচেটিয়া বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়েছেন। এদিকে স্বাস্থ্যের অভাবে আমাদের জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে দেশবন্ধু অমন বয়সে মরতেন না, স্বামীজীর মতো সূর্য উনচল্লিশ বছরেই অস্ত যেত না, যতীন দাস একষট্টির বদলে একশো একষট্টি দিন উপোস করে আরো বেশি নাম করতে পারতেন! জীবনের যে পথেই যান না কেন, খ্যাতি, অর্থ, যোগ্যতা—এই সবের মূলেই চাই স্বাস্থ্য, শুধু লেখাপড়ায় আর চলবে না। লেখাপড়ার যুগ আজ চলে গেছে। এম.-এ., বি.-এল. পাস করেও লোকে আজ একটা চাকরি পায় না, খেতে পায় না, কিন্তু গায়ে শক্তি থাকলে রিক্সা টেনেও, মুটে হয়েও খেতে পারে। ব্যায়ামীদের যে কোনো দিন খাবার অভাব হয় না, তা' তাদের শরীর দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সেইসব দিক ভেবে বাঙালীর অন্নসমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা ব্যায়াম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি।

এই ব্যায়াম বিশ্ববিদ্যালয় ব্যায়ামসাগর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বেদানা-হিন্দ্ মহাশয়ের অভিনব অনবদ্য পরিকল্পনা। এমনটি আর জগতের কোথাও নাই। জগতের সভ্যতাকে এগিয়ে দেবার মতো বহু মহান্ উপাদান ভারতীয় মনীষীরা জগৎকে দান করেছেন, আমাদের বেদানা-হিন্দ্ মহাশয়ের এই বিশ্ববিদ্যালয় সেই সকলের মধ্যে একটি। শুধু বেদানা-হিন্দ্ মহাশয়ের দ্বারাই এটি সম্ভব হয়েছে।

বেদানা-হিন্দ্ মহাশয় ঐতিহাসিক পুরুষ—স্বপ্নে মহাবীর আলেকজাণ্ডারকে তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছেন, রাণা প্রতাপ সিংহের প্রিয় চৈতকের মৃত্যুতিথিতে তিনি বছরে একদিন কাঁদেন, শিবাজীর মতো দাড়িগোঁপ রেখেছেন, রঞ্জিৎ সিংয়ের মতো মাথায় পাগড়ী বাঁধতে জানেন, বিজয় সিংহের মতো সাঁতার কাটেন, লক্ষ্মণ সেনের মতো দৌড়োতে পারেন, প্রতাপাদিত্যের মতো বক্সিং জানেন। শুধু কি সেযুগের কথা, এযুগের স্যার সুরেন্দ্রনাথের জামাকাপড়ের ইনি হিসাব রাখতেন, দেশবন্ধুর ব্রিফ্ লেখার সময় কলমে কালি ভরে দিতেন, ভীম নাগের বাড়ি থেকে স্যার আশুতোষের জন্যে সন্দেশ নিয়ে আসতেন, দেশপ্রিয় বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মোটারের দরজা খুলে দিতেন, রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে ইনিই আতর মাখান, সেইজন্যই সর্বসম্মতিক্রমে এই মহান্ পুরুষকে আমরা এই ব্যায়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত করেছি।

আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় নতুন হ'লেও আমাদের এই সাধনা আজ নতুন নয়, এতোদিন এই মহানগরীর বুকে অন্তঃসলিলার মতো আমাদের কার্যধারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল, আজ বহু গুণী ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষকের অনুরোধে বেদানা-হিন্দ্ মহাশয়ের অমর বাণী প্রচার ও বিস্তারের জন্য আমরা প্রকাশ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সাহসী হ'লাম। আমাদের এই ব্যায়ামসাগর বেদানা-হিন্দ্ মহাশয়ের উৎসাহ পেয়েই শ্রীরাজেন্দ্র গুহঠাকুরতা বাঙালীর মধ্যে প্রথম বুকে হাতী চাপাতে সাহসী হন। বেদানা-হিন্দের ছাত্র হিসাবে শ্রীপুলিন দাশ

প্রথমে লাঠি খেলা অভ্যাস করেন। গোবরবাবু কুস্তি শেখেন, শ্রীবলাই চাটুয্যে যখন গড়ের মাঠে ছুটাছুটি করে বেড়াতেন তখন বেদানা-হিন্দ্ মহাশয়ই তাঁকে ডেকে এনে বক্‌সিং ও হাইজাম্প শেখান, শ্রীগোষ্ঠ পালকে ইনিই ফুটবলে সট্ মারতে শেখান, শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ প্রথমে এঁরই হাত ধরে পুকুরে স্নান করতে নাব্‌তেন, শ্রীবিষ্ণু ঘোষের মাংসপেশী ও মোটার সাইকেলের খেলা মহামান্য বেদানা-হিন্দ্ মহাশয়েরই বহু সাধনার ফল। এক কথায়, ব্যায়ামসাগর বেদানা-হিন্দ্ মহাশয়ের মতো সর্বগুণসম্পন্ন লোক বাংলা, তথা ভারতবর্ষ, শুধু ভারতবর্ষ কেন সমগ্র এশিয়াতেই কোনোদিন জন্মাননি এবং ভবিষ্যতেও জন্মাবেন না। তাই বলি, হে বাংলার যুবকেরা, এ সুযোগ হারাবেন না, এই ঈশ্বর-জানিত মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, দৌড়, লাফাই, কুস্তি, সাঁতার, বক্‌সিং, বারবেল্, ডাম্বেল, প্যারালাল বার, রোমান রিং ট্রাপিজ, ডেভেলাপার, এক্স প্যাণ্ডার, দড়ির খেলা, দাঁড়টানা, ভার-তোলা, পেশী খেলা প্রভৃতি শিখুন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম কাটান, আমাদের ব্যায়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখান। যে বিদ্যা আপনাকে অন্নসংস্থান করতে শেখাবে না, সে লেখাপড়া শেখায় আপনাদের লাভ কি? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে, বেদানা-হিন্দ্ মহাশয় আপনাদের পয়সা উপায় করতে শেখাবেন—গায়ে জোর থাকলে, কিছু না হ'লেও, কাবুলিওলাদের ঠেঙিয়ে আপনারা অনেক টাকা উপায় করতে পারবেন। আসুন, আপনারা দলে দলে আসুন, এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না! ইতি

০০০।১নং বেদানা-হিন্দ্ এভেন্যু
ব্যায়াম-গঞ্জ
কলিকাতা

ব্যায়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের
সিনেটের সভ্যগণ

কলিকাতার মতো শহর! পথে একটা লোক পা পিছ্‌লে পড়লে তখুনি চারিপাশে লোকের ভিড় জমে যায়, আর এমন জাঁকালো

এক বিজ্ঞাপন দেখলে লোক তো হবেই। তবে যে ঠিকানা লেখা ছিল তা, কলকাতায় কোনোখানেই নেই, এই যা কথা! না থাক, কিন্তু কোনো বড় বিষয় চাপা থাকে না, দেখতে দেখতে বিকালের দিকে পথে ভিড় জমে বীরেনের বাড়ির সামনে।

বীরেন প্রথমে তো দুর্ভাবনায় পড়ে গেল, তখুনি ছোট ভাইকে বন্ধু জীবনের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। এসব বিষয়ে জীবনের মাথা খুব, এসে বীরেনকে বললে—নাম করার এই তো সুযোগ! তাড়াতাড়ি তোর দাদার সেই লম্বা ডাক্তারী-কোটটা বা'র কর্।

ল্যাব্রেটরীতে ব্যবহারের জন্য বীরেনের দাদার একটি লম্বা শাদা রংয়ের কোট ছিল, সেটি পরে, প্রকাণ্ড পরচুলের একটি দাড়ি আর ঘাড় পর্যন্ত লম্বা একটি পরচুল মাথায় লাগিয়ে গান্ধী টুপী মাথায় পরে একেবারে পুরোদস্তুর রবীন্দ্রনাথ সেজে বীরেন নীচে নেমে এসে একখানি চেয়ারে বসল। জীবন চাকর সেজে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে দিলে, দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনারা কি চান?

—আমরা বেদানা-হিন্দ্কে দেখতে এসেছি—ভিড়ের মধ্যে থেকে সবাই একসঙ্গে বললে।

—বেশ, ভেতরে আসুন, তিনি ঘরে বসে আছেন।

প্রথমে তড়াক করে একটি কালোমতো ছেলে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকলো। বীরেনের সামনে গিয়ে একখানি বিজ্ঞাপনের কাগজ বা'র করে বললে—এটা আপনার বিজ্ঞাপন? আপনিই কি বীরেন্দ্র বেদানা-হিন্দ্?

—হ্যাঁ।

—রাজেন ঠাকুরতার নামে আপনি এসব কি লিখেছেন, আমি তাঁর ছাত্র। জানেন আমরা আপনার নামে কেস্ করতে পারি?

তার পিছনে আরেকজন ঢুকেছিল, সে বললে,—কেস করবো কেন! বলাই চাটুজ্যের নামে যা' তা' লিখেছে, আমি এখুনি ওকে এক ঘুষিতে শায়েস্তা করে যাবো—

পিছন থেকে আরেকজন এগিয়ে এসে বললে—ঘুষি মারার দরকার নেই, আমরা প্রফুল্ল ঘোষের চেলা, দড়ি আর কলসী দিয়ে ওকে আমরা গোলদীঘির জলে ডুবিয়ে দিয়ে আসবো।

আরেকজন এগিয়ে এসে বললে—ওসব কিছু হাঙ্গামা করতে হবে না, আমরা গোবরবাবুর আখড়ায় লড়ি, স্রেফ্ দু'খানি রদ্দা দিয়ে দোব, ব্যাস্!

আরেকজন বললে—তোমাদের কোনো হাঙ্গামা পোহাতে হবে না, আমি বিষ্ণুবাবুর ক্লাব থেকে এসেছি, ওকে আমি বিষ্ণুবাবুর মোটর বাইকের চাকার সঙ্গে বেঁধে দোব!

আরেকজন বললে—তোমরা যাই কর আর তাই কর ভাই, এক ঘা লাঠি আমি মাথায় মারবই, পুলিনবাবুর এ অপমান আমরা সইব না!

ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী-পরা মাথায় কোঁকড়ানো চুল একটি ছেলে এবার এগিয়ে এলো, বললে—তোমরা যা করতে হয় পরে কোর, আমায় ভাই তার আগে একটু সময় দিও। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ও কিনা যা-খুশি তাই লিখেছে! ওর ওই এক-একগাছি দাড়ি ছিঁড়ে দড়ি বানিযে আমি আমার কবিতার খাতা সেলাই করবো।

ব্যাপার দেখে জীবন আগেই সরে পড়েছিল, বীরেনের বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ি পড়ছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়িটার পানে তাকিয়ে বললে, আপনাদের যা বলার আছে, আরেকদিন এসে বলবেন, এখুনি আমায় একবার বেরুতে হবে, আমাদের সিনেটের মিটিং আছে—তারপর চিৎকার করে বললে—ওরে জীবন, গাড়ি ঠিক হয়েছে?

গাড়ি বীরেনের কোনোদিনও ছিল না, তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্য এই পন্থাটি জীবন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। তখুনি ভিতর থেকে জীবনের গলা শোন গেল—হয়েছে বাবু!

—আচ্ছা, আপনারা তাহলে আর একদিন আসবেন, আপনাদের সব কথা শুনবো'খন, আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমি যাচ্ছি!

আমরা গোবরবাবুর আখড়ায় লড়ি, স্রেফ্ দু'খানি রদ্দা দিয়ে দেবো, ব্যাস্!

এই বলে বীরেন যেই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাবে, অমনি জনকয়েকে মিলে আলখাল্লা টেনে ধরল, বললে—যাই বললেই হোল!

—আমার ঘুষি না খেয়েই চলে যাবে?

—আমি আগে মাথায় লাঠি মারবো তারপর কথা।

—ব্যায়াম-সাগব তুমি, আমার রদ্দা কি সুন্দর একবার চেখে যাবে না?

—তোমরা সব দাঁড়াও ভাই, দাড়ির দু' গাছি চুল আগে ছিঁড়ে নি—বলে কবি বীরেনের দিকে এগিয়ে গেল।

বীরেনের দাদা ডাক্তার, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছে এসে দেখেন, দরজার সামনে মস্ত ভিড়, মোটর আর এগোয় না। বাড়িতে চোর পড়লো নাকি! তাড়াতাড়ি কোনো রকমে ভিড় ঠেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন, ঠিক সেই সময় বীরেনের পরচুলের দাড়ি থেকে কবি চুল ছেঁড়ার উপক্রম করছে, বীরেনের দু' হাত দু'জনে ধরে আছে, বেচারা নিরুপায়!

বীরেনের দাদা তো অবাক, এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি হে, চোর নাকি?

একটি ছেলে পকেট থেকে একখানি বিজ্ঞাপনের কাগজ বা'র করে তাঁর হাতে দিল।

আগাগোড়া পড়ে তিনি হাসবেন কি কাঁদবেন ঠিক করতে পারলেন না। শেষে এগিয়ে এসে তার মাথার টুপীটা ফেলে দিয়ে পরচুলের দাড়ি আর চুল এক টানে খুলে নিলেন, তারপর কানটি আচ্ছা করে মলে দিয়ে বল্লেন—হতভাগা, তিনবার ম্যাট্রিক ফেল্ করে তুমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার হয়েছ!

অমন দাড়িওলা অতবড় লোকটি এক মিনিটে এমন ছেলেমানুষ হয়ে যাবে কে জানে! বিস্ময়ের ভাবটা সামলে যেতেই সকলে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেচারা বীরেন আবার ম্যাট্রিক্ দেবার জন্য এখন অবিরাম লেখা অভ্যাস করছে।

কমলের কথামালা

প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের দিন শিবু আবৃত্তি করে সুনাম করবে আর মাথার ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে স্টাইলে ঘুরে বেড়াবে, আর কমলের মুখের পানে চেয়ে মাঝে মাঝে অবজ্ঞার হাসি হাসবে —কমলের কাছে এসব একেবারে অসহ্য। কমলও যে আবৃত্তি করতে জানে তা শিবরামকে দেখিয়ে দিতে হবে। কমল সেইদিনই একখানি 'কথা ও কাহিনী' কিনে আনলো। তারপরেই বিকালের খেলাধুলা একেবারে বন্ধ, ঘরের দরজা বন্ধ করে বারবার শুধু চিৎকার—

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ্
নির্মম নির্ভীক।...

আর তারই সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে আরশির সামনে ভঙ্গী অভ্যাস করা শুরু হ'ল।

ইস্কুলের পড়াশুনা বাদ দিয়ে পাঁচ-ছ ঘণ্টা ধরে বক্‌বক্ করে কমল অতো বড় কবিতাটি সেইদিনেই কোনো রকমে তো মুখস্থ করলো পরদিন ইস্কুলে গিয়ে বললো—স্যার, আমিও আবৃত্তি করবো।

—তুমি কী আবৃত্তি করতে চাও?

—রবীন্দ্রনাথের বন্দীবীর।

—মুখস্থ আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বইখানাও এনেছি!

—দেখি।

কমল তাড়াতাড়ি এক গোছা বইয়ের মধ্যে থেকে মলাট বেছে 'কথা ও কাহিনী' নিয়ে মাস্টার মশাইয়ের হাতে দিল।

মাস্টার মশাই আগ্রহে বই খুলে দেখেন—কথামালা। বললেন —এ যে কথামালা!

কথামালা! কমল তাড়াতাড়ি বইখানি ফিরিয়ে নিয়ে দেখে কথা ও কাহিনী ভেবে যে বইখানি সে নিয়ে এসেছে তা কথামালা। একই রকমের মলাটের জন্যই ভুল হয়েছে।

মাস্টার মশাই বললেন—তুমি আবার আবৃত্তি করবে! বই চিনতে শেখো আগে। তারপর—

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হো হো করে হেসে উঠলো, কমলের মনে হ'ল শিবু যেন তাদের মধ্যে একটু বেশি জোরে হাসলো।

কমল মনে মনে গজগজ করতে লাগলো। কিন্তু নিজের ভুল, মুখে তো কাউকে কিছু বলার নেই।

প্রাইজের দিন কাছে এসে পড়লো।

একদিন ক্লাশে নোটিশ পড়লো, যারা আবৃত্তি করতে চায় তারা যেন কাল তৈরি হয়ে আসে। হেড মাস্টারমশাই শুনবেন ও বেছে নেবেন।

কমল পরদিন আবার বই নিয়ে ইস্কুলে গিয়ে হাজির। হেড মাস্টার মশাইয়ের কাছে আবৃত্তি করার আগে একবার ভাল করে পড়ে নেবে।

ছুটির পর হেড মাস্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে আবৃত্তি করতে হবে। শেষ ঘণ্টায় কমল বই খুলে বসলো, মনে মনে সে গুনগুন করে উঠলো—

অলখ্ নিরঞ্জন
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয় ভঞ্জন।

কিন্তু বই খুলেই কমলের মাথা ঘুরে গেল। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারলো না, এ যে সেই—একদা এক বাঘের

গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। অতো করে দেখে-শুনে শেষে এই কথামালাখানিই সে ইস্কুলে নিয়ে এসেছে! তা হোক, কিন্তু তাই বলে কমল পিছিয়ে যাবার ছেলে নয়, ছুটির পর হেড মাস্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

প্রথমেই শিবরামের পালা। গরগর করে শিবু 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি করে গেল।

শিবুর পরেই কমল।

কমল শুরু করলো ভালো ভাবেই। বলেও যাচ্ছিল ভালোই। কিন্তু খানিকটা বলে যাবার পর হঠাৎ আটকে গেল। আর কিছুতেই মনে আসতে চায় না। দুবার বিড়বিড় করে ভেবে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু মনে আর পড়লো না। শিবুর কাছে বই ছিল। ভাবলো একবার দেখে নেয়, কিন্তু শিবুর সঙ্গে কথা নেই। কমল বই চাইতে পারলো না।

হেড মাস্টার বললেন—কি হলো?

—আজ্ঞে, এক জায়গায় বেধে গেছে স্যার।

—তোমার দ্বারা হবে না।

—কাল তৈরি করে নিয়ে আসবো স্যার।

—পরশু প্রাইজ, আর কবে তৈরি করবে?

রাগে দুঃখে কমলের মুখ কালো হয়ে গেল। হেড মাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে সে বেরিয়ে এলো। এতো করেও তার আবৃত্তি করা হ'ল না—শুধু এই কথামালা বইখানার জন্য! এই বইখানা না থাকলে ঠিক 'কথা ও কাহিনী' নিয়েই সে ইস্কুলে আসতো। একবার দেখে নিলেই ঠিক তার মনে থাকতো। হেড মাস্টার মশাইয়ের ঘরে শিবুর সামনে এসব অপদস্থ হ'তে হ'ত না। ট্রানস্লেশন করার জন্য দাদা এই বইখানি তাকে কিনে দিয়েছেন। এই কথামালাখানিকে সে বিদায় করবেই। দাদা সেজন্যে যা বলে বলুন।

পথের সেইখানেই কমল কথামালাখানি ফেলে দিল।

খানিকটা গেছে, পিছনে ডাক পড়লো—বাবু—বাবুজী—

কমল ফিরলো, বললো—আমায় ডাকছ ?

—হ্যাঁ, বাবুজী, আপনার কেতাব—বলে লোকটি কথামালাখানি কমলের দিকে এগিয়ে দিল।

—ও বই আমি চাইনে, তুমি নাও।

—এ বাংলা কেতাব হামি নিয়ে কি করবে বাবুজী! লোকটি বইখানি কমলকে ফিরিয়ে দিলে।

কমল কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল এই বই নিয়ে সে আজ আর বাড়ি যাবে না। লোককে দিয়ে দিলেও নেবে না, ফেলে দিলেও অন্য লোক কুড়িয়ে এনে দেবে। বেশ, এবার সে একে এমন জায়গায় ফেলবে যে, লোকের চোখেই পড়বে না। বাড়ির পাশে একটি সরু গলি ছিল, সেখানে লোক বসতো না, দুপাশের বাড়ি থেকে শুধু জঞ্জাল পড়ে জমা হ'ত, তার মুখে কমল বইখানি ফেলে দিলে। এমনভাবে ফেললো যেন হাতের এক গোছা বইয়ের মধ্যে থেকে ও বইখানি ফসকে পড়ে গেল।

কমল সবে বাড়ির দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকেছে এমন সময় বাবাও বাড়ি ঢুকলেন, ডাকলেন—কমল!

কমল থমকে দাঁড়ালো। দেখলো বাবার হাতে তার সেই কথামালা।

বাবা এগিয়ে এসে বেশ করে কানটা মলে দিয়ে বললেন—হতভাগা ছেলে, বইখানা হাত ফসকে পড়ে গেল খেয়ালই নেই, এমনি করে পড়াশুনা হয়! ভাগ্যিস আমি পিছনে ছিলাম না হ'লে তো বইখানা যেতো!

বইখানি বাপের হাত থেকে নিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে কমল ভেতরে চলে গেল।

কমল ঠিক করলে, এই বই নিয়ে যখন এতো ব্যাপার তখন

এ বইখানি সে আর একদিনও ঘরে রাখবে না। সে না হয় আরেক

হ্যাঁ, বাবুজী, আপনার কেতাব—

খানা কথামালা কিনে আনবে যার মলাটের সঙ্গে 'কথা ও কাহিনী'র মলাটের গোলমাল হবে না।

সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরুবার সময় কমল কথামালাখানি সঙ্গে নিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখে-শুনে গোলদীঘির রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে জলের দিকে বইখানি ছুঁড়ে দিল। বইখানি ঝুপ করে যেই জলে পড়েছে অমনি পাশ থেকে কমলের হাতখানি কে চেপে ধরলো। কমল মুখ ফেরাতেই লোকটি বললো—জলে কি ফেললে খোকা?

—একখানা বই।

—তোমার বই?

—হ্যাঁ।

—তুমি জান না এ পুকুরে কোনো জিনিস ফেলতে নেই। ওই দরজার সামনে সাইন বোর্ডে লেখা আছে—

—আমি তো তা জানি না. কতো জনকে কতো জিনিস আমি ফেলতে দেখেছি।

—তারা আমার চোখে পড়েনি। তুমি যখন আমার চোখে পড়েছ, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়?

—থানায়।

—থা-থা-থানায়? কিন্তু আ-আমি তো জানি-নি যে—থানার নাম শুনেই কমল এতো ভয় পেল যে. তার কথা সব জড়িয়ে যেতে লাগলো।

—থানায় গিয়ে সেই কথাই বলবে, এখন চল—লোকটি কমলের হাতখানি চেপে ধরে একরকম প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে চললো।

কমলের মাথা ঘুরে গেল। থানায় নিয়ে গিয়ে তাকে আটকে রাখবে, বাবা জানবেন, খবরের কাগজে নাম ছাপা হবে, ইস্কুলের ছেলেরা হাসবে।

চট্ করে কমলের একটা কথা মনে পড়লো। বললো—আচ্ছা, এজন্যে আমার কত ফাইন হবে বলুন তো?

লোকটি বললো—দু টাকা। তবে তুমি ছেলেমানুষ বলে এক টাকাও হতে পারে।

—বেশ, থানায় না গিয়ে সেই টাকাটা না হয় আমি আপনার হাতে এখনি দিয়ে দিচ্ছি—আপনি আমায় ছেড়ে দিন।

—তা কি হয়? আইনমতো তো কাজ করতে হবে।

—আইন তো আপনাদের হাতে, এই নিন। বলে কমল পকেট থেকে একটি টাকা বের করে লোকটির হাতে দিল।

টাকাটা হাতে পেয়ে লোকটি কমলের হাত ছেড়ে দিল। কমল আর দাঁড়ালো না। হনহন করে এগিয়ে গিয়ে সে পথের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে তবে স্বস্তি পেল। আজ সে খুব বেঁচে গেছে, ভাগ্যিস ইস্কুলের মাইনেটা আজ দেওয়া হয়নি, পকেটে টাকা ছিল তাই রক্ষে। যাক্, যে কথামালা থেকে এতো অনর্থ, আজ তা শেষ হলো।

বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে কমল পড়তে বসলো। পড়তে বসেই হেড্ মাস্টার মশাইয়ের কাছে আবৃত্তির কথাটা তার মনে পড়লো। 'বন্দীবীর'-এর যেখানে সে ভুলে গিয়েছিল, সেইখানটা দেখে নেবার ইচ্ছা হ'ল। 'কথা ও কাহিনী' টেবিলের উপরেই ছিল, পৃষ্ঠাও মনে ছিল, কমল খুলে ফেললো। বই খুলে কমল স্তব্ধ হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। বন্দীবীরের বদলে, কথামালার বাঘের পাতা তার সামনে খোলা রয়েছে—'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।'

কথামালা ভেবে টেবিলের উপর থেকে সন্ধ্যেবেলা 'কথা ও কাহিনী'খানা নিয়ে গিয়ে কমল গোলদিঘির জলে ফেলে দিয়ে এসেছে।

কমলের কান্না পেল।

বিড়াল বিপত্তি

মা ঘুমিয়ে পড়লে কোন্ ফাঁকে কয়েকটা আমের মোরব্বা চুরি করে এনে খাবে সেই কথাই অমিয় ভাবছে এমন সময় দরজার ফাঁকে বন্ধুর মুখখানি দেখতে পাওয়া গেল। অমিয় বললো—এসো!

বন্ধু ভিতরে এসে বললো—ভাই বড় বিপদে পড়েছি।

--কি হয়েছে?

—দিদিমার সেই বিড়ালটা পালিয়ে গেছে, দিদিমা ফিরে এলেই মহা ব্যাপার হবে। দিদিমা বিড়ালটা আমার কাছে রেখে নবদ্বীপ গেছেন, কাল সকালে ফিরবেন। যাবার সময় বারবার বলে গেছেন 'বেড়াল যেন না পালিয়ে যায়।' ব্যাটাকে একটা নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে নরেনদের বাড়িতে খানিকক্ষণ ক্যারাম খেলতে গেছি। আর ফিরে এসে দেখি মহাপ্রভু দড়ি কেটে পালিয়েছেন। এখন কি করি বল্ দেখি? ও বিড়াল না পাওয়া গেলে তো চলবে না—ওটা মামাবাবুর পোষা বিড়াল ছিল, মামাবাবু মারা যাবার পর থেকে ওই বিড়ালটাকেই দিদিমা ছেলের মতো যত্নে রেখেছেন। ওই বিড়ালটা হারিয়ে যাওয়া মানে দিদিমার রাগ, আর দিদিমার রাগ মানে নগদ দিদিমার চল্লিশ হাজার টাকা একেবারে বে-হাত! ও বিড়াল তো যাওয়া নয়, আমাকে পথে বসিয়ে যাওয়া। আমার বিলাত যাওয়া, ব্যারিস্টার হওয়া—সব গেল। এখন কি করি বল্ দিকি?

—সমস্ত বাড়িটা ভাল করে খুঁজে দেখেছ?

—নিশ্চয়ই।

—আরেকবার গিয়ে দেখ দিকি। হয়তো দেখবে রান্নাঘরে বসে বসে মাছ খাচ্ছে।

—তা তোমার হাতে তো এখন কোনো কাজ নেই। তুমি একবার চলো না ভাই, দুজনে মিলে খুঁজে দেখবো।

বন্ধুর অনুরোধ, সেদিনকার মতো মোরব্বার আশা ছেড়ে অমিয় বেরিয়ে পড়লো।

বন্ধুর বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর, খাটের নীচে, আলমারির কোণ, সব দেখেশুনে বন্ধুর পড়ার ঘরে ফ্যানের নীচে বসে অমিয় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, সহসা বন্ধু বলে উঠলো—ওই দেখ্ ওই বাড়ির পাঁচিলে ব্যাটা বসে আছে—

অমিয় জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো পাঁচ-ছয়খানা বাড়ির পরে একটি পাঁচিলের উপর একটি বিড়াল বসে আছে। বললো—ওই বেড়ালটা ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। একবার চলো না ভাই ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আসি। বলে বন্ধু উঠে দাঁড়ালো।

ইচ্ছে না থাকলেও অমিয়কে তার সঙ্গে যেতে হলো।

কয়েকটা গলি ঘুরে সেই পাঁচিলটার নীচে এসে দাঁড়ালাম। বন্ধু ডাকলো—মেনি মেনি আঃ আঃ—

মেনি ঘাড়টা ঘুরিয়ে একবার তাকালো মাত্র তারপর বাদশাহের মতো চালে বসে রইলো।

—দুখানা ইট মারো, মারের ভয়ে পাঁচিল থেকে নেমে ছুটবে, তখন গিয়ে ধরবে।

—কিন্তু যদি কোনো চোট লাগে, আর দিদিমা জানতে পারে তাহলে—

—তবে আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে পাঁচিলে গিয়ে ওঠ—

—ততক্ষণে হয়তো পালিয়ে যাবে। তার উপর বাড়ির লোকেরা চোর চোর বলে যদি চেঁচায় ?

—তাহলে ছুটে বাড়ি গিয়ে দুখানা মাছ নিয়ে এসো। মাছ দেখলেই ও ঠিক নেমে আসবে।

সহসা বাড়ির ওদিককার বারান্দায় এক বিরাট বপু ভদ্রলোক

এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কি খোকা, তোমরা ওখানে কি করছ ?

—আজ্ঞে, ওই বিড়ালটাকে ধরার জন্যে···আমাদের বিড়াল কিনা তাই—

—ওই বিড়ালটা তোমাদের বিড়াল নাকি ? ব্যাটা আজ আমার ত্ব' ছটো ডিমভরা কৈ মাছ খেয়ে পালিয়েছে, তার দামটা আমায় দিয়ে যাও দিকি ? দাঁড়াও, আমি নীচে যাচ্ছি—

ভদ্রলোক এখনই নীচে নেমে আসবে বুঝে বন্ধুকে তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে এনে অমিয় বললো- আর এখানে দাঁড়ালে নগদ মাছের দামটা লোকসান যাবে। ভদ্রলোক বাইরে আসার আগেই চলো আমরা সরে পড়ি, ও বেড়াল যখন এখানেই আছে তখন রাত্তিরে ঠিক তোমাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হবে।

কিন্তু বন্ধু কি আর সহজে আসতে চায়, বললো—কিন্তু মিনি যদি আজ রাত্তিরে না আসে তখন ?

অমিয় বললো—তার জন্যে কি ? সারা কলকাতা শহরে কি ওই একটি বিড়ালই আছে। আর একটা জোগাড় করতে কতোক্ষণ সময় লাগবে ?—এক মিনি যাবে, অন্য মিনি হবে, দিদিমার বিড়াল পোষা ফাঁক নাহি রবে।

—দেখি, শেষে হয়তো তাই করতে হবে, চল্লিশ হাজার টাকা তো আর অতো সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না ! বলে বিষণ্ণমুখে বন্ধু বাড়ি ফিরে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই আগে বন্ধুর কথাটা মনে পড়লো। বেচারার মিনি ফিরেছে কি না কে জানে ! আটটার ট্রেনে দিদিমা ফিরছেন, বিড়াল না দেখতে পেলেই তো অনর্থ ঘটবে। দিদিমার চল্লিশ হাজার টাকার আশা বন্ধুকে ছাড়তে হবে। কলকাতা শহরে এতো বিড়াল থাকতে একটা বিড়ালের জন্য এতোগুলি টাকা

যাবে? পাশের বাড়ির ননীদের একটা সাদা বিড়ালের বাচ্চা আছে না?

তখনই ননীকে ডেকে বিকালে ঘুগ্‌নি খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে আধঘণ্টা ছুটাছুটি করে বিড়ালের বাচ্চাটি অমিয় ধরলো, তারপর বরাবর একেবারে বঙ্কুর বাড়িতে।

বঙ্কু বাড়ি ছিল না। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করলো—হ্যাঁরে, বিড়ালটা ফিরে এসেছে?

—না দাদাবাবু।

তাহলে অমিয় তো বিড়ালটা এনে ভালোই করেছে। বিড়ালটা কোলে নিয়ে অমিয় বঙ্কুর জন্য বসে রইলো।

কতোক্ষণ বসে আছে, সহসা দরজা খুলে গেল, ট্রেনের ঝাঁকানি খাওয়া পরিশ্রান্ত দেহে বঙ্কুর দিদিমা ঘরে ঢুকলেন। অমিয়কে দেখে বললেন—বঙ্কু কোথায় বাবা?

দিদিমাকে খুশি করার জন্য অমিয় বললো—ও এইমাত্র গেল। একটা লাল রিবন কিনে আনতে। আপনার মিনির গলায় বাঁধলে বেশ মানাবে---

—তাই বুঝি মিনিকে তোমার কাছে রেখে গেছে?

দিদিমা আমার কাছ থেকে বিড়ালটিকে নিয়ে আদর করতে লাগলেন—মিনি মিনি মিনু --

—আপনার বিড়ালটি বেশ দিদিমা --

কথাটা সবে শেষ করেছি এমন সময় বঙ্কু এসে হাজির। তার কোলে একটা বিড়াল। ঘরের ভিতর এসেই সে বলে উঠলো—দিদিমা! তোমার মিনি—

দিদিমার কোলের উপর একটা বিড়াল দেখে বঙ্কুর মুখের কথা ফুরিয়ে গেল।

—মিনির কি হয়েছে রে? দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

--এই মিনি—মিনির এক বন্ধু জোগাড় করে আনলুম। তুমি কাছে না থাকলে মিনির বড় কষ্ট হয় তাই।

এমন সময় ও পাড়ার মতিলাল একটা বিড়াল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বঙ্কুকে দেখে বললে—দেখ্ বঙ্কু, তোর যে বিড়ালটা কাল হারিয়ে গেছে, এটা তারই মতো দেখতে। ব্যাটা রোজ দুপুরে এসে চুরি করে দুধ খায়। কাল অনেক কষ্টে ব্যাটাকে ধরেছি—এই নে—

দিদিমা বঙ্কুর মুখের পানে চাইলেন। বঙ্কু তাড়াতাড়ি বললো—ভালই হলো মিনির আর একটা সাথী হলো।

সহসা নিতাই একটা বিড়াল কোলে করে এসে হাজির হলো। বললো– দেখ্ তো বঙ্কু, এটি তোদের সেই হারিয়ে যাওয়া বিড়াল মিনি কিনা। কাল আমার ঘরে ঢুকে খাটের নীচে চুপ করে বসে ছিল। তোর দিদিমার কথা মনে করে ধরে নিয়ে এলাম।

ইতিমধ্যে ঝুপ করে একটি বিড়াল জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে দিদিমার পায়ের কাছে এসে 'ম্যাও ম্যাও' করতে লাগলো। অমিয়র বিড়ালটি ফেলে দিয়ে দিদিমা সেই বিড়ালটি কোলে তুলে নিলেন। দিদিমার মুখের পানে তাকিয়ে আর সেখানে থাকা সুবিধাজনক নয় দেখে অমিয় সরে পড়লো।

হবুচন্দ্রের হরতাল

রাজা হবুচন্দ্র একদিন বললেন—মন্ত্রী, এভাবে তো আর দিন চলে না। সকালে রাজসভা, দুপুরে ঘুমুনো, সন্ধ্যায় দাবা খেলা—এ যে একঘেয়ে হয়ে গেল। নতুন কিছু চাই।

মন্ত্রী গবুচন্দ্র একটু ভেবে বললেন—আমিও তাই চাই।

সেনাপতি বললেন—একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দিন, আপনি হাতীর পিঠে যাবেন, সঙ্গে হাজার হাজার সৈন্য, পিছনে জগঝম্প বাজবে, তারপর মারিমারি লুটোপাটি চেঁচামেচি—জমজমাট সরগরম ভাব।

হবুচন্দ্র বললেন -মারামারি মানে খুনোখুনি ?

সেনাপতি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। শত্রুকে হারাতে পারলেই আপনি হবেন বীর রাজচক্রবর্তী, পরমভট্টারক, মহানায়ক, মহাশূর, অরিনাশন, নরসিংহ, ভুবনবিজয়ী, বিক্রমকেশরী আরো কত কি!

হবুচন্দ্র বললেন—না, মারামারি ভাল না।

রাজকবি বললেন—তাহলে গান-বাজনার আসর বসান। কালোয়াতি গান চলুক সারারাত ধরে।

মন্ত্রী গবুচন্দ্র বললেন—সে তো এক লাইনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারারাত গাইবে আর হাত নাড়বে—অসহ্য!

হবুচন্দ্র বললেন—ওসব পুরোনো ব্যাপার, নতুন কথা বল।

রাজপণ্ডিত বললেন—এর জন্য কি? নাওয়া খাওয়া ঘুমানো খেলা বেড়ানো সবই পুরোনো হয়ে গেছে। এর উল্টো কর—নতুন হবে। অর্থাৎ, হরতাল কর।

রাজা বললেন—হরতাল কি রকম? করতালের মত বাজনা?

—না। সব কাজ বন্ধ, এ হলো ফাঁকতাল আর ফাঁকি।

রাজা বললেন—সে তো ভারী মজার ব্যাপার। কোটাল, ঘোষণা করে দাও, আজ থেকে সাতদিন সবাই ফাঁকতাল পালন করবে।

কোটাল তখনই ঢাক আর ঢাকী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সারা নগরে ফাঁকতালের ঢেঁড়া পিটিয়ে দিল—রাজার হুকুম—

সাতদিন সব বন্ধ, শুধু ফাঁকি আর ফাঁকি।
কাজকর্ম খাওয়া পরা সব থাকবে বাকী।
দোকানপাট হাটবাজার বসবে নাকো কিছু,
গাড়ি ঘোড়া চলবে নাকো, করবে না কেউ কিছু,
সাতদিন বন্ধ সব—রাজার হুকুম।
বাড়ি বসে যত পার লাগাও গে ঘুম।
যদি কেউ কোনো কাজ করে ফেল ভুলে
একশো বেত পড়বে পিঠে, নয়তো যাবে শূলে।

দেখতে দেখতে পথঘাট শূন্য হলো, দোকান-পাট বন্ধ হলো। রাজা খুশি হলেন। বললেন—চল গবু, বাগানে গাছতলায় শুয়ে থাকি গে।

রাজা মন্ত্রী গাছতলায় শুয়ে পড়লেন, শুতে না শুতেই ঘুম।

ঘুম ভাঙলো বেলা শেষে।

হবুচন্দ্র বললেন—গবু, বড় খিদে পেয়েছে।

গবু হাক দিলেন—এককড়ি!

সাড়া নেই। রাজা বললেন—আর কাউকে ডাকো।

মন্ত্রী ডাকলেন—তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি

কোনো সাড়া নেই।

রাজা এবার নিজেই হাঁকলেন—নরহরি, ভজহরি, রাখহরি, থরহরি, বলহরি—

কোনো সাড়া নেই।

—হলো কি? চল তো দেখি—বলে রাজা উঠলেন। মন্ত্রীকে নিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। সে ঘরে কোনো মানুষ নেই কোনো খাবার নেই।

গবু বললো—সবাই ফাঁকতাল করছে।

হবু বললেন—তাহলে খাব কি ?

গবু বললেন—রাঁধতে হবে না। এমন খাবার খাব—ফলমূল খাবো।

—সে তো গাছ থেকে পাড়তে হবে ?

—হবে।

—গাছে উঠবে কে ? তুমি গাছে উঠবে তো চল—

হবুচন্দ্র গবুকে নিয়ে এলেন বেলগাছ তলায়, বললেন—ওঠো—

গবুচন্দ্র বললেন—আমি বেল পেড়ে দোব, তা মাটিতে পড়বে। আপনি তা কুড়িয়ে খাবেন ? কুড়িয়ে খায় ভিখারী। রাজার মর্যাদা রাখতে হবে, আপনাকে গাছে উঠে খেতে হবে। আমি ধরছি, আপনি উঠুন।

গবু হবুকে কাঁধে নিলেন, কাঁধ থেকে হবু গাছে উঠলেন। সামনেই একটা বেল। হবুচন্দ্র সেই বেলটা ধরেছেন অমনি মটাং—ডাল ভেঙে হবুচন্দ্র পড়লেন মাটিতে, পড়েই কাতরে উঠলেন--গবু, আমি মারা গেলাম।

গবু হবুকে তুলে ধরলেন, হবু দাঁড়াতে পারলেন না। পা মচকে গেছে, বললেন—রাজবদ্যিকে ডাকো, আমি বাঁচবো না।

গবু ছুটলেন রাজবৈদ্যের কাছে। রাজবৈদ্য বললেন—আজ সব কাজ বন্ধ, রাজার হুকুম আমি অমান্য করবো না।

—রাজাই তো ডাকছেন।

—কিন্তু হুকুম তো চলছে।

—রাজা মারা যাবেন।

—না, এখন মরা চলবে না। কে কাঁধে করে নিয়ে যাবে ?

—তাহলে ? গবু ছুটলেন পণ্ডিতের কাছে বিধান নিতে।

সবশুনে রাজপণ্ডিত বললেন—রাজা ঠিক থাকলে রাজার হুকুম চলবে। রাজার তো পতন হয়েছে। কাজেই রাজার হুকুমের মেয়াদ শেষ, ফাঁকতাল শেষ হয়েছে।

—রাজার পতন হয়েছে ?

—হ্যাঁ। গাছ থেকেই হোক, ছাদ থেকেই হোক, সিঁড়ি থেকেই হোক, কলার খোসায় পা পিছলেই হোক, রাজা পড়লেই রাজার পতন। রাজার পতন বলেই রাজার হুকুম শেষ। তুমি তোরণের নহবৎখানায় গিয়ে শিঙে ফুঁকে দাও—ফাঁকতাল শেষ।

গবুচন্দ্র রাজবাড়িতে এসে নহবৎখানায় শিঙা ফুঁকলেন—ফাঁকতাল শেষ, রাজার পতন হয়েছে।

এই ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজকবি পরে ইতিহাস লিখলেন—

হবু রাজার পতন হলো, গবু ফুঁকলো শিঙে
দেশজুড়ে ফাঁকতাল তিনবেলা,
রাজ্য চলে গড়গড়িয়ে, কাজের সবাই ঝিঙে
বুদ্ধির সব কাবুলি কাঁচকলা!